চিন্তয়সি

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২ দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ৯ রুস্তমজী ষ্ট্রীট,
বালিগঞ্জ হইতে প্রকাশিত।

পাঁচ সিকা

এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি নানা মাসিক-পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। তাদের বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তন ঘটেছে। পত্রিকার সম্পাদকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সূক্ষ্ম-সমালোচনার দৃষ্টিতে আমার মতামতের মধ্যে একাধিক বৈষম্য ধরা পড়বে নিশ্চয়। কিন্তু সেজন্য আমার চিত্তবৃত্তির গতিকে দায়ী করাই ভাল। মনের প্রকৃতি স্থিতিপ্রবণতার প্রতিকূল।

কিন্তু মতামতের ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে কোথায় যেন একটা নিভৃত ও নিশ্চিত, প্রশান্ত ও অবিচল কেন্দ্র রয়েছে। তাকে আবিষ্কার করাই আমার প্রতি সুবিচার, আমার শ্রেষ্ঠ উপকার। আমার কাছে আমার মনই সব চেয়ে বড় সত্য। সে সত্যের অপেক্ষা গভীর ও ব্যাপক সত্যের সন্ধানে আমার চিত্ত বিক্ষুব্ধ। বিক্ষোভের অবসানে আমি অন্য স্তরে আরোহণ করব,—এই আমার দুরাশা। দুরাশা-পোষণেই পাঠকবৃন্দের সঙ্গে লেখকের আন্তরিক সম্বন্ধ। মতামতে গরমিল থাকবেই।

ভাষার জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তবে বোধ হয় প্রবন্ধের বিষয়গুলিকেও দুর্ব্বোধ্যতার জন্য আংশিকভাবে দায়ী করা চলে। সম্পূর্ণভাবে নয়, কারণ পাথরকেও রূপায়িত করা যায়, এবং রূপান্বিত হলেই শিলা হয়ে ওঠে শিল্প।

মনের কাজে অবসর মিলল না। পটভূমি চরিত্র ও ঘটনা-বহুল হলে অবকাশ পাওয়া দুর্লভ। অথচ, অবকাশের সলজ্জ-সকাশেই শ্রী ফুটে ওঠে। চিরকাল আবাদ করলে প্রাচুর্য্যের অভাব হয় না; অভাব হয় লক্ষ্মীশ্রীর। জমি পতিত রাখার প্রয়োজন স্বীকার করি। মনে মনে, প্রাণে প্রাণে নয়।

আমার মন গন্তব্যস্থানে এখনও উপস্থিত হয়নি। অতএব কোন বিষয়েই আমার মন্তব্য আমার কাছেই শেষ-কথা নয়। পরের কাছে ত' দূরের কথা।

অনিশ্চিতের অনুধ্যানে যাঁদের শঙ্কা নেই তাঁরাই আমার সমগোত্র।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২০শে ডিসেম্বর,
১৯৩৩

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের
চরণকমলে

সূচী

পৃষ্ঠা

বিজ্ঞান ও মানবধর্ম্ম—

কস্মৈ দেবায় ... ৩
নর্ম্মাল ... ২৩
যোগধর্ম্মের যুক্তি ... ৩৩
যুগধর্ম্মের অন্যদিক ... ৫৩

সাহিত্যিকা—

সাহিত্যিকের যুক্তি তথা
সাহিত্যে মিথ্যাবাদ ... ৭৭
সমাজধর্ম্ম ও সাহিত্য ... ৯১
বিশ্ব-কবি ... ১১৪

দেশ ও প্রগতি—

দেশের কথা ... ১২৫
প্রগতি ... ১৫২

বিজ্ঞান ও মানবধর্ম্ম

কস্মৈ দেবায়

নর্ম্মাল

যোগধর্ম্মের যুক্তি

যুগধর্ম্মের অন্যদিক

কষ্টেস্ম্ম দেবায়

কিছুদিন পূর্ব্বে এডিংটন্, জীন্স্ ও মিলিক্যান্ পড়ে একটা তথ্য আবিষ্কার করি—বৈজ্ঞানিকেরা মানুষ ছাড়া অতিমানুষ নন্। তাঁরাও মানুষের মতন নিজেদের পাতিহাঁসকে রাজহংস বিবেচনা করেন, এবং মানুষের মতনই নিজেদের বিশেষ-জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয় নিয়ে বক্‌তে গেলেই বোকামি করে বসেন। তাঁদের এই 'মানুষিক' ব্যবহার দেখে ভারি আনন্দ হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে তাঁদের উপর রাগ ছিল। অঙ্কশাস্ত্রে তাদের ব্যুৎপত্তিকে হিংসা করতাম, মনে হতো সূত্রগুলো মন্ত্রের মতনই লোক ঠকাবার যন্ত্র মাত্র। প্রায়ই ভাবতাম, অঙ্কের হাত থেকে কি পরিত্রাণ নেই? নানান্ রকমের বিজ্ঞান রয়েছে, নতুন নতুন বিজ্ঞান তৈরি হচ্ছে, সেখানে অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ কোন জবরদস্তী নেই, তাদের বিষয়-বস্তু শিশি-বোতলের মধ্যে, বাগানে, চিড়িয়াখানায়, বনজঙ্গলে আত্মগোপন করে রয়েছে, তারা সংখ্যার কবলে পড়েনি, ধ্যানরসিকদের মস্তিষ্কের মধ্যে বন্দী হয়ে তাদের পূর্ণসত্তা এখনও বিধ্বস্ত ও বিখণ্ডিত হয়নি, ভাবতাম কবে সেগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে, কবে পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি সুসজ্জিত হয়ে ভদ্রলোকের পাঠোপযোগী হবে? কবে সেই পরীক্ষক-বৈজ্ঞানিকের সাধনা সম্পূর্ণ হবে, কবে তাঁরা প্রয়োগাগার থেকে বেরিয়ে, মুক্ত হাওয়াতে দাঁড়িয়ে জগতের সম্মুখে নিজেদের বক্তব্য প্রচার করবেন? তাঁদের উপরই সমাজতাত্ত্বিকের ভরসা, কেননা, আমরা না পারি পরীক্ষা ও প্রয়োগ করতে, না পারি সাংখ্যিক

সূত্র খাটাতে, অথচ জ্ঞানের অভাবে সমাজ রয়েছে অনেক পিছনে পড়ে। আমি জানতাম যে, এই সব বিজ্ঞান বয়সে শিশু, তাদের সাধনা অসম্পূর্ণ, যতটুকু হয়েছে তার প্রচারও ভাল রকম হয়নি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতির তুলনায়। আমি জানতাম যে, সাধনার প্রথম স্তরে মন্ত্রগুপ্তির নিতান্ত প্রয়োজন থাকে। আমাদের শিক্ষাও এত একপেশে হয়েছে যে, নব্যবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জানবার শক্তি ও ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু মনে মনে আমার ভয় ঘোচেনি, একটা সন্দেহ বরাবরই ছিল যে, আজ না হয় কাল এ-সব বিদ্যাও সংখ্যাতত্ত্বের অধীনে আসবেই আসবে। কারণ, ভবিষ্যদ্বাণী করাই যদি বিজ্ঞানের চরম সামাজিক সার্থকতা হয়, সমাজের মঙ্গল-বিধানই যদি বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য, বিশেষত এই সব নতুন বিজ্ঞানের অব্যবহিত লক্ষ্য হয়, তাহলে ভবিষ্যদ্বাণী-গুলো সঠিক করার জন্যে সংখ্যা ছাড়া আর কি উপায় আছে? সংখ্যার দৌত্যেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যের সখ্যলাভ করে। কিন্তু আবার ঐ পদার্থ-বৈজ্ঞানিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিকেরাই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সংখ্যামূলক সামান্য গুণের একটা স্বাতন্ত্র্য ও বড় রকমের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, সত্তার সঙ্গে তার কোন সাম্য কি সাদৃশ্য, সালোক্য কি সাযুজ্য, সাজাত্য কি স্বারূপ্য কিছু নেই, আছে শুধু সার্ষ্টি, অর্থাৎ সত্তার সমান ঐশ্বর্য্য, ও সারথ্য। কিন্তু কায়া বাদ দিয়ে ছায়া নিয়ে পড়ে থাকলে মানুষের চলে না। আমার কারবার মানুষ নিয়ে, মানুষের সমাজ নিয়ে, যেখানে মানুষ বিচিত্র ও খেয়ালি, বিশেষ করে যেখানে একটা গড়পড়তা গতির বিবরণ

ও ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া নিয়মের অন্য অর্থ ও মূল্য নেই। আমার ব্যবসা সমাজতত্ত্ব নিয়ে, যার তত্ত্বকথা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সম্বন্ধের ভেতরে ও অন্তরালে, সংস্কারের ব্যাপ্তিতে যে ব্যক্তিস্বরূপ থাকে তাকে বোঝা ও ফুটিয়ে তোলা। অথচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাস করার মতন যৌগিক দুঃসাহস আমার ছিল না। আমার জানা ছিল যে, পদ্ধতি জিনিষটাই একটা সামাজিক ব্যবস্থা, অতএব ইতিহাসে তার একটা স্থান ও কর্ত্তব্য আছে। যেমন পূর্ব্বে ম্যাজিক ছিল, এখন তেমনি লজিক হয়েছে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে নানা রকমের সুবিধা ও অধিকতর সমস্যার নিরাকরণ সম্ভব হয়েছে, অতএব তার প্রতিপত্তি অমান্য করবার স্পৃহা ও স্পর্দ্ধা আমার কখনই ছিল না। এ-যুগে জন্মে, এ-যুগের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। বোধ হয়, বিশ্বাসের মাত্রাধিক্যটুকু যুক্তিতর্কের দ্বারা মার্জ্জনাও করেছি। যে-পদ্ধতিতে নানা কারণে বিশ্বাস করতাম, সেই পদ্ধতির মূলে সংখ্যা থাকার জন্য পূর্ব্বে কোন সন্দেহই উঠ্‌ত না। যখন সংখ্যার কারচুপিতে সংশয় এল, তখন ঘট্‌ল বিপদ। এখনও সন্দেহের দোলাতেই দুল্‌ছি। এক-একবার ইচ্ছে হয়, এডিংটন্, জীন্‌সের বৈজ্ঞানিক মন্তব্যগুলি যাচিয়ে নিই, অথচ সে বিদ্যা নেই। তাই মনে হলো, যে-বিজ্ঞান সংখ্যার ওপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত নয় তারই সিদ্ধান্ত নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। জীবতত্ত্বকে বেছে নিলাম প্রধানত ঐ কারণে। তা ছাড়া আমার ধারণা ছিল এই, যে-কালে তত্ত্বটির গোড়ায় জীব কথাটি রয়েছে, আর আমরা

যখন জীববিশেষ, অর্থাৎ আমাদেরও যখন অন্যান্য জীবের মতন জীবন রয়েছে, তখন পদার্থবিজ্ঞানের চেয়ে জীব-তত্ত্বের কাছে জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধান প্রত্যাশা করাই সঙ্গত হবে। সেইজন্য খানকয়েক নামজাদা জীবতাত্ত্বিকের নতুন বই পড়লাম।* বলা বাহুল্য, সমস্যার বিশেষ কোন সমাধান হলো না। জীব-তত্ত্বের বই পড়ে ভাল করে জীবন চালাবার বিশেষ কোন সুবিধা হয়নি। কেন হলো না তাই লিখছি। গোটা-কয়েক কারণ মাত্র নির্দ্দেশ করতে পারব।

প্রধান কারণ এই যে, বর্ত্তমান জীবতত্ত্ব সংখ্যার নাগপাশে জড়িয়ে পড়েছে দেখলাম। এতদিন ধরে জীববিজ্ঞান একটা না একটা মতের আশ্রয়ে বেড়ে উঠছিল, এবং সেই মতের যুক্তি খোঁজবার ভার নিয়েছিলেন এমেচারের দল। সেইজন্য অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব এত বিস্তীর্ণ হয়েছিল। ডারুইন্ সাহেবের প্রধান কাজ ছিল জীবের শ্রেণীভাগ ও শ্রেণীর ভৌগোলিক বিভাগ করা। শ্রেণীর উৎপত্তির ইতিহাসটা তাঁর অব্যবহিত অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের সীমার বাইরে ছিল। তাঁর শিষ্যবৃন্দ যখন তাঁর মতটা উৎপত্তির ইতিহাসে খাটাতে লাগলেন, তাঁর

*Philosophy of a Biologist—Sir Leonard Hill, F.R.S., (Edward Arnold & Co.), The Nature of Living Matter—L. Hogben, Professor of Social Biology, London University (Kegan Paul), Mind at the Crossway—C. Lloyd Morgan (Williams Norgate), The Biological Basis of Human Nature—H. S. Jennings (Faber & Faber), Science and Religion—B. B. C. Talks (Howe, 1931), The Making of Man: An outline of Anthropology—Edited by V. F. Calverton, (The Modern Library), Life: Outlines of General Biology—Sir J. A. Thomson & Prof. Patrick Geddes (2 Vols., Williams Norgate), Causes of Evolution—J. B. S. Haldane.

বই-এর নামের দোহাই দিয়ে, তখন নানা বাধা-বিঘ্ন এসে হাজির হলো। একটি মত সত্য কি মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না, অন্য একটি মতের দ্বারা। সেইজন্য যে লামার্কিয়ান মতের খানিকটা ডারুইন্ নিজেই গ্রহণ করেছিলেন সেটার উজ্জীবনে জীববিজ্ঞানের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হলো না। অ-বৈজ্ঞানিকের হাত থেকে জীবের মুক্তি বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠল। এই সময় আবিষ্কৃত হলো মেণ্ডেলের বইটা। তারই সহায়তায় জীবতত্ত্ব প্রয়োগাগারে প্রবেশ লাভ করলে। "ত্যজ আশা প্রবেশি এ দ্বারে।" কিন্তু বারব্যাঙ্কের মত প্রয়োগশিল্পীর দল ভারী ছিল না, তাই জীবতত্ত্ব পড়লো অধ্যাপকের হাতে এসে। সে হাতে এলে আর রক্ষা নেই। মেণ্ডেলের পাটিগণিত হয়ে উঠল বীজগণিত—টম্‌সন্ ও গেডিস্ বল্‌ছেন আইনষ্টাইনের পাল্লায় পড়বার সম্ভাবনা জীবতত্ত্বের যথেষ্ট রয়েছে। লিওনার্ড হিল্ বিশদভাবে দেখালেন যে, পরমাণুর সঙ্গে জীবকোষের গঠন-সাদৃশ্য খুব বেশি। অন্যধারে আবার, পদার্থবিজ্ঞানের দিক থেকে, হোয়াইট্‌হেড্ চাইছেন যে, পরমাণুর আন্তর্জাতিক সম্বন্ধটি বীজকোষের পরস্পর ব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করা হোক্। হগ্‌বেন্ বলেন, জীবতত্ত্বে physico-chemical reaction-এর দ্বারা যতদূর ব্যাখ্যা চলে তার মধ্যে প্রাণবাদ আনবার কোন দরকার নেই। তাঁর মতে, বাঙ্‌ময় জগতে, সামাজিক আলোচনার আসরে, mechanistic পদ্ধতিই একমাত্র উপায়; সাধারণের আদান-প্রদানের হাটে, ব্যক্তিগত গোপন কথা, গোপন ব্যথা প্রকাশ করা আগে যেমন ছিল অভদ্ররুচির চিহ্ন, এখন তেমনি হয়ে উঠেছে অবৈজ্ঞানিক,

অযুক্তিসঙ্গত। নব্য-নৈয়ায়িকদের মত' এতদূর পর্য্যন্ত বলতে তিনি রাজি নন্ যে, যা প্রকাশ্য নয় তার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু অব্যক্তের আপেক্ষিক মূল্য নিশ্চয়ই কম, এতটা পর্য্যন্ত তিনি ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে হয়—বিশেষত ধর্ম্ম ও আর্টের আবেদনের আলোচনা পড়ে। যদি জীবতত্ত্বকে প্রয়োগাগারের পরীক্ষার ওপর দাঁড় করান যায় তাহলেও mathematical physicist-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় রয়েছে মনে হয় না। পরীক্ষা করতে গিয়েই জে, বি, এস, হল্‌ডেনের মতন অধ্যাপকেরা জীবতত্ত্বকে উচ্চাঙ্গের অঙ্কে এনে ফেলেছেন। এখন জীবের সৃষ্টিকর্ত্তাকে অঙ্কশাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বলেই মানতে হবে। সব বিজ্ঞানই কি শেষে আইনষ্টাইনের দাসত্ব করবে, যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডারুইনের এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিউটনের দাসত্ব করেছিল? আইনষ্টাইনের মৃত্যুর পর জগৎ কিছু পিছু হটবে না। Corpuscular theory-তে ফিরে যাবার কথা শুনলে তুষ্টু ঘোড়ার দৌড়বার সময় চাট মারার কথা মনে হয়। ওটা বিজ্ঞানের retroactive action, back-kick, কাজের কথা নয়, কাজের কাজ হচ্ছে এগিয়ে চলা।

দ্বিতীয় কারণ এই,—একদল বৈজ্ঞানিক বলছেন, বিশ্বটা হলো ধ্বংসাভিমুখী, সাবানের বুদ্‌বুদের মতন বাড়তে বাড়তে কোনদিন ফেটে যাবে। এক সাহেব অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, বিশ্বটা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে, আবার আর একজন অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, কড়াভাজা রুটির মতন তার ধারগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে। আবার একজন

'বিশ্ব-রশ্মির' সন্ধান পেয়ে অভয় দিচ্ছেন যে, বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষতিপূরণ চলছে। আবার জীনস্ অঙ্ক কষে দেখাচ্ছেন ক্ষতিপূরণ হতেই পারে না। এই ঝগড়ার মিটমাটের উপর জীববিজ্ঞানের প্রতি আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস অনেকটা নির্ভর করছে। যদি বিশ্বই যায় নষ্ট হয়ে তাহলে অভিব্যক্তি নিরর্থক হলো, যদি-না মানুষে গীতার ধর্ম্মানুসারে নিষ্কাম হয়ে 'মা ফলেষু কদাচন' মন্ত্র জপ করে। ও মন্ত্রে আশ্বস্ত হওয়া আমাদের মতন দূরদর্শী লোকের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের ঘুম হয় না, রাবণ দশটা মাথা নিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় পাশ ফিরতেন কি করে, তাই ভেবে। যদি বিকীর্ণ শক্তির পুনঃসঞ্চয় সম্ভব হয়, তাহলে জীবতাত্ত্বিক উল্লসিত হয়ে অভিব্যক্তি-বাদে অবিশ্বাসীকে জেলে দিতে পারবেন, খুন করতে পারবেন, এই এক আশা ও সান্ত্বনা রয়েছে। কিন্তু আজ তারিখ পর্য্যন্ত ঝগড়া মিট্‌ল না, অবিশ্বাসীরাও বেঁচে রইলেন। যে-ছেলের অল্পবয়সে ফাঁড়া আছে, গণৎকার ঠাকুর ঠিকুজি দেখে বলেছেন, তাকে স্কুল-পাঠশালে পাঠাতে ইচ্ছা না হওয়াই বাপ-মার পক্ষে স্বাভাবিক। সেইজন্যই মাতুলী শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানতে হয়।

তৃতীয় কারণ,—দেখতে পাচ্ছি যে, জীবতাত্ত্বিকের মধ্যে দু'টি দল পাকিয়ে উঠেছে। তাঁরা নিজেদের অন্য আখ্যা দিলেও তাঁদেরকে যন্ত্রবাদী mechanist ও vitalist অর্থাৎ প্রাণবাদী বলা যেতে পারে। আজকালকার বাজারে বিশুদ্ধ যন্ত্রবাদ ও বিশুদ্ধ প্রাণবাদের খাতির কমেছে। হগ্‌বেন্ নিজেকে বলছেন mechanist publicist, লয়েড্ মর্গ্যান্ নিজেকে emergent evolutionist

পূর্ব্ব থেকেই বলেছেন, সেই মতের একটু অদল-বদল করে সেনাপতি স্মাট্‌স্ নিজেকে হোলিষ্ট (Holist) বললেন, জে, এস্ হল্‌ডেন্ ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে এসে, respiratory pigment-এর রিসার্চ্চ ছেড়ে দিয়ে, বেতারের মারফৎ জগৎকে জানালেন যে, হোলিজ্‌ম্ মানা ছাড়া জীবতাত্ত্বিকের কোন উপায় নেই। জেনিংস্, যে জেনিংস্ নিতান্ত মাথা-ঠাণ্ডা লোক, তিনিও উদ্‌গতিবাদের তরফদারি করে তাঁর পুস্তক সমাপ্ত করলেন। মোদ্দা কথা এই দাঁড়িয়েছে, লয়েড্ মর্গ্যানের মত নেবো, না নেবো না। তাঁর প্রধান বক্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করেছেন, এবার মনো-জগতে সে মতটি প্রয়োগ করেছেন একটু বিস্তারিতভাবে। তিনি বলছেন, দেখা যাচ্ছে যে জগতে গোটাকয়েক পরিষ্কার স্তর কিংবা কোষ রয়েছে, অজীব, জীব, মন, প্রত্যেকটির মধ্যে ব্যবধান, সান্তরতা রয়েছে যেটা পার হতে গেলে লাফাতে হয়, প্রত্যেক স্তরে এমন একটি আগন্তুক নতুন গুণের আবির্ভাব হচ্ছে যার সম্বন্ধে পূর্ব্বের ধাপ থেকে কোন প্রকার ভবিষ্যদ্বাণীই করা যায় না। এখন মজা হলো এই যে, এ-ধরণের উদ্‌গতিবাদে বিশ্বাস করলে অনেক সুবিধা হয়। অজীব, জীব, মন—বিবর্ত্তনের এই মোটা ধারাটি মানলেই আত্মতৃপ্তি আসে—কেননা, যেটি শেষে প্রকাশিত সেইটিই সব চেয়ে উন্নত, আর যেটি উন্নত, অনুন্নতের উপর একটা স্বাভাবিক দাবী তার থেকেই যায়। এবং দাবী ও 'স্বাভাবিক' দাবীটা যে দাবী করে ও সে দাবী আদায় করতে যে জানে তার পক্ষে কত সুবিধা তা প্রত্যেক ইংরাজ জানে ভারতবাসী সম্বন্ধে, পুরুষ জানে স্ত্রীর, পিতা জানে পুত্রকন্যার, ব্রাহ্মণ জানে শূদ্রের, মানুষ জানে

জীবজন্তু ও বনজঙ্গল সম্বন্ধে। তারপর, ধর্ম্মরক্ষাও হয়। যদি মন পর্য্যন্ত এসে থাকে তাহলে মনের ওপারে যাবে না কেন? আর ওপারে গেলেই ধর্ম্ম, আত্মা, ভগবান প্রভৃতির মধ্যে একটা কিছুতে পৌঁছতেই হবে। দার্শনিকের সেরা দার্শনিক আলেক্‌জাণ্ডার এই বিশ্বাসই করেন। আমরা ত' বিশ্বাস করবই, তাঁর মাত্র একটা deity, আমাদের তেত্রিশ কোটি, ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যার চেয়ে মাত্র কিছু কম, অহিন্দুদের দেবতা নেই কিনা! ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদের লয়েড্ মর্গ্যান্ ভারী সুবিধা করে দিয়েছেন। শুধু কি তাই? যাঁরা মানুষ নিয়ে কারবার করেন, যেমন কবি ও সমাজতাত্ত্বিক, তিনি তাঁদেরও পূজার্হ। মানুষ আগে ছিল বীজ, এখন হয়ে উঠল এক আজব চিজ। তার মনুষ্যত্বই হলো তার নতুনত্ব, তার বৈশিষ্ট্য, তার খেয়ালই হলো তার সব, তার কোন নিয়ম-কানুন নেই, অতএব আর অঙ্ক কষতে হবে না, শুধু তার ব্যবহারের মজার মজার বিবরণ দিলেই চলবে; তার ভয় ভাবনা, আশা ভরসা, আদর্শ অভিলাষ যখন তাকে জীবজগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবেই পৃথক্ করেছে, তখন আর তাকে পায় কে? আর একটি লাফ, আর দেবত্ব হাতে হাতে! সেইজন্য বলি, এই নতুনত্বের ওপর জোর দিতে গিয়ে, এই বড় বড় ফাঁকগুলো আরো বড় করে দেখাতে গিয়ে, স্থিতি ও গতি থেকে মতির পার্থক্য ফোটাতে গিয়ে, মানুষের দাম্ভিকতা লয়েড্ মর্গ্যান্ বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু যৌক্তিকতার সাতত্য রক্ষা করতে পারেননি। এ-সব মত শুনলে মানুষের মতিগতি ফিরে আসে, আত্মার দিকে। লেমায়তারকে পরিত্যাগ করে চণ্ডীদাসের বুলি

আঁওড়ান যায়; মানুষই হয়ে ওঠে মানুষের একমাত্র আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ খোশগল্প চলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি school for scandal-এ প্রকাশ্য ভাবেই পরিণত হয়; এতদিন পরে mechanistic ও vitalistic ব্যাখ্যার প্রকৃত সমন্বয় হয়। যে প্রাকৃতিক সমাবেশে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে, যে দুর্ঘটনায় মানুষের মত মানুষের 'সহসা উদয়' হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তির যখন তিলমাত্র সম্ভাবনাও নেই, যখন মানুষের মনটা একেবারে আজব চীজ, যখন প্রত্যেক স্তরে নতুন গুণ, নতুন ব্যবহার তৈরি হতে চলেছে, তখন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সব গোলমাল চুকে গেল, প্রকৃতিদেবীর পূর্ব্ব হতেই রচিত সিংহাসনে মানুষ স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হলো। তার পর শুধু 'জয় মা' বলে লাফ দেওয়া! Mind is an emergent বলাও যা, মানুষকে দেবতা বলাও তা।

কিন্তু কেমন যেন ভয় হয়, কোথায় যেন খট্‌কা লাগে। ধরলাম লেমায়তার, এডিংটন্, জীন্‌স্ ভুল বলেছেন। তবু খট্‌কা থেকেই যায়। অবশ্য লয়েড্ মর্গ্যানের মত গ্রহণ করলে বিজ্ঞানকে বাদ দিতে হয় না। বরঞ্চ বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের ওপর আস্থাবান হতেই তিনি বলছেন। শুধু নতুন অবস্থান, নতুন গঠন, নতুন শৃঙ্খলা, নতুন গুণ, নতুন ব্যবহার সৃষ্টি হচ্ছে মানলেই যে পূর্ব্বাবস্থার ঘটনা ও নিয়মাবলীর উপর পরের অবস্থার নির্ভরশীলতা অস্বীকার করতে হবে, তাও নয়। জেনিংস্ এই কথা বলছেন। বলছেন খুবই ভাল করে, কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে।

প্রথম প্রশ্ন ওঠে 'নতুন' কথাটির মানে নিয়ে। যেটা আগে ছিল অথচ জানতাম না, তাকে নতুন বলা হয়।

বলা বাহুল্য, লয়েড্ মর্গ্যান্ এ অর্থে কথাটি ব্যবহার করেননি। অন্য অর্থ হচ্ছে, আগে ছিল না, এখন হয়েছে। হয়েছে, অর্থাৎ ফুটে উঠেছে, নতুন গঠনে, নতুন সজ্জায়, নতুন শৃঙ্খলায়। এ-রকম আকছার হয়। কিন্তু কি হয়, নতুন fact হয়, নতুন ঘটনা হয়, না নতুন সম্বন্ধ হয়? নতুন সম্বন্ধই হয়। লয়েড্ মর্গ্যান্ বলছেন, সব কিছুই নতুন হয়। সব কিছুই নতুন হয়, স্বীকার করা চলতে পারে, যদি সম্বন্ধকেই fact ও ঘটনা গণ্য করা হয়। কিন্তু সম্বন্ধ ও 'সম্বন্ধীর' (relata) মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে সন্দেহ হয়। মনে কোনটা আগে কোনটা পরে ওঠে, তা নিয়ে অনেক তর্ক উঠতে পারে। এই সন্দেহ ও তর্কের অবসান সম্ভব যদি সঙ্গে সঙ্গে মানা হয় যে, fact কিংবা ঘটনারূপী সম্বন্ধটারও, অন্যান্য fact ও ঘটনার মতনই, একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা ব্যাখ্যা সম্ভব; অর্থাৎ যদি সেই সঙ্গে মানা হয়, জীবজগতের নতুনত্বটা, মনোজগতের নতুনত্বটা, অজীবজগতের নতুন ঘটনার মতনই, সেই একই উপায়ে বুঝতে হবে, অন্য উপায়ের প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে একই উপায়ে বোঝা হচ্ছে না। লয়েড্ মর্গ্যান্ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হতে পারেন, কিন্তু সে পদ্ধতির ধারাবাহিকতা তিনি মানেন না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা ছেড়ে দিলেও বলা যায় যে, তাঁর হাতে যুক্তির মালা ছিঁড়ে গিয়েছে। নতুনত্ব ও নতুন যদি এক না হয়, যদি 'নতুনত্ব' হয় এক প্রকারের সম্বন্ধ, আর 'নতুন' হয় ঘটনা কি 'সম্বন্ধী', তাহলেও ন্যায়ের ধারাবাহিকতা মানতে হবে। তাও তিনি মানছেন না। বিজ্ঞান যুক্তির বাইরে নয়, যুক্তিতর্ক

পূর্ব্বাপর পরম্পরা মেনে চলে—তাও অতিপূর্ব্ব নয়, জোর দু'টি আগের ধাপ, যার থেকে 'নতুন' হঠাৎ আবির্ভূত হচ্ছে; এবং যুক্তির প্রত্যেক ধাপটি অন্যের সঙ্গে সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথা। অতএব সেই ধাপের ফাঁকে অশ্বত্থগাছ জন্মাচ্ছে শুনলে সিমেণ্টেরই দোষ মনে হয়। যে সিমেণ্ট ফেটে গিয়েছে, সেই ফাটলের মধ্যে অশ্বত্থগাছের বীজই পড়েছে, রেক্তার গাঁথুনী হলে বীজ হঠাৎ পড়লেও গাছ বেরুত না।

অন্য প্রশ্ন ওঠে। নতুন কি হিসাবে পুরাতনের চেয়ে বড়? নতুনত্বই কি তার একমাত্র দাবী? এক যদি নতুন পুরাতনের অপেক্ষা বহুলাঙ্গ হয় তাহলে দাবী খাটে। কিন্তু গঠনচাতুর্য্যের দিক থেকে অণু পরমাণু জীবকোষের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই, এই ত শুন্‌ছি। যত নতুন তত মূল্যবান, লয়েড্ মর্গ্যানের মনস্তত্ত্বে নীতিশাস্ত্রের এই বীজ রয়েছে। সেটা কতদূর বাঞ্ছনীয় বুঝতে পারি না।

সন্দেহ আবার ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যদি physico-chemical method মনের রাজ্যে এতই অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে হল্‌ডেন্-স্মাট্‌স্-সংবাদের পূর্ব্বে কোন্ পদ্ধতির সাহায্যে হল্‌ডেনের রিসার্চ্চে এত নাম হলো, যার খাতিরেই তিনি গিফোর্ড লেকচারার, বেতার-বক্তা হলেন? তিনি কি কখনও ফিজিয়লজিতে physico-chemical method অবলম্বন করেননি? তাঁর চোখের সামনে কি প্রত্যেক সমগ্রতাটি ল্যাবরেটারীতে যাবার পূর্ব্বেই ফুটে উঠ্‌ত? জগদীশবাবুর ঐ রকম ফুটে ওঠে শুনেছি, বক্তৃতামঞ্চে ও লেখাতে তাই বলেছেন, কিন্তু তাঁর ল্যাবরেটারীতে গেলে তাঁর চোখ দেখে ত' তা মনে হয় না।

তাঁর দৃষ্টি reagent ও তার প্রতিক্রিয়ার ওপরই নিবদ্ধ থাকে। ফিজিয়লজির প্রথম উপদেশ, ভাল করে খেয়ে আত্মরক্ষা করা—সেটাও তিনি পালন করেন না। আবার মজা এই যে, হল্‌ডেন্‌সাহেব লয়েড্‌ মর্গ্যানের মতকে অশ্রদ্ধা করেন। তিনি হোলিজ্‌ম্‌-এর প্রতি নিতান্তই আস্থাবান। কিন্তু whole-টাই যদি একটা emergent quality হয়? হওয়া খুবই সম্ভব, তাঁর তর্কপদ্ধতি অনুসারে, যদিও রিসার্চ্চপদ্ধতি অনুসারে নয়। ব্যাপারখানা এই, হল্‌ডেন্‌ ও মর্গ্যান্‌ তু'জনেই সাধারণ যুক্তির ধারাবাহিকতা মানেন না।

আবার যাঁরা মানেন তাঁদেরও সব কথা বুঝি না, সব মতামত মানতে পারি না। ইতঃপূর্ব্বে প্যাভ্‌লভ্‌ পড়ি, বুঝতে পারিনি সব কথা, শেষে তার সম্বন্ধে তু'একখানি বই পড়লাম। ওয়াট্‌সন্‌ বোঝা যায়। অবশ্য, তাঁদের লেখা পড়ে আমার লয়েড্‌ মর্গ্যান্‌ ও হল্‌ডেনের বিপক্ষে আপত্তি জোর পেয়েছে। প্যাভ্‌লভ্‌ হচ্ছেন ফিজিয়লজিষ্ট, অতএব মানুষ জীবজন্তু থেকে কোথায় ও কতটুকু পৃথক ও এক, এইটা আবিষ্কার করাই হলো তাঁর কাজ। মানুষের আছে forebrain, যার জন্যই সে অন্যান্য জন্তুর মতন জড়প্রকৃতির ক্রীতদাস নয়, স্বাধীন। মস্তিষ্কের এই সামনের অংশটাই হচ্ছে conditioned behaviour-এর কাঠামো। অতএব মানুষ পৃথক হলো এই হিসেবে যে, সে অন্যান্য জন্তুর চেয়ে বেশি সংখ্যক conditioned behaviour গ্রহণ করে অভ্যাসে পরিণত করতে পারে। কিন্তু তিনি মানুষ নিয়ে পরীক্ষা করেননি—পরীক্ষা করেছেন কুকুর নিয়ে।

তাতে তাঁর সিদ্ধান্তের কিছুই আসে যায় না, বরঞ্চ ভালই হয়—জুলিয়ান্ হাক্স্লি ও ওয়েল্স্ অকাট্য যুক্তির দ্বারা দেখিয়েছেন। প্যাভ্লভের পরীক্ষায় কুকুরটা প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা এই যে, ব্যবহারের কার্য্যকারণ ঠিক হচ্ছে physico-chemical process-এর দ্বারা, এবং পরীক্ষাগারে কুকুরে মানুষে তফাৎ নেই। পরীক্ষার ভেতর তাঁর কোন অসাবধানতা আছে, কেউ বলেছেন শুনিনি। কিন্তু গোল বাঁধে তাঁর সিদ্ধান্তকে সমাজতত্ত্বে খাটাতে গিয়ে। প্যাভ্লভের মতে শিক্ষিত হবার ক্ষমতাই যখন মানুষকে পৃথক করে, তখন সমাজের অনেক কর্ত্তব্য জুটল, আমাদের উন্নতিতে আমাদের অনেক হাত আছে ভাবাই আমাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল। ওয়াট্সন্ একবার বলেছিলেন—আমি যে কোন শিশুকে জোয়াকিমের মত বাজিয়ে করে তুলতে পারি। লক্ষ্ণৌএর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অন্য কথা বলেন। আমেরিকায় কি হয় জানি না, তবে ভারতবর্ষের কোন শিক্ষক conditioning-এ অতটা বিশ্বাসী হতে পারেন না। পাকা idiot-কে ওয়াট্সনের মতন অধ্যাপকও করা যায় না। মোদ্দা কথা, জীবের উত্তরাধিকার মানতেই হবে। হাঁসপাতালের শিশু মা বাপের কোলের খোকাও নয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত আমরা করবই করব, তবে আমাদের ভুল বৈজ্ঞানিকের ঘাড়ে না চাপালেই হলো। ওয়াট্সনের কথা ছেড়ে দিচ্ছি—তাঁর রিসার্চ্চ-এর একটা news-value আছে। ভাগ্যিস প্যাভ্লভ্ রাশিয়ায় জন্মেছিলেন—যে দেশের সবই খারাপ, তাই রক্ষে! সেইজন্য তাঁর কাজে খাদ মিশতে পায়নি, তাঁকে Gifford Lectures দিতেও

ইংরেজ ডাকেনি। তাঁর কৃতিত্ব হলো এই যে, জীবজগতের ব্যবহারের অনুসন্ধানে তিনি সেই পুরাতন mechanistic রীতি নীতি পদ্ধতি ছাড়েননি, মস্তিষ্কের বিচিত্র ব্যবহারের ব্যাখ্যাতে physico-chemical reaction-এর ওপর নির্ভর করেন, কোন emergent value তিনি লক্ষ্য করেননি, অতএব মানেননি, জীবের আর অজীবের মধ্যে ব্যবধান আছে স্বীকার করেও নতুন পদ্ধতি, নতুন যুক্তি গ্রহণ করেননি, সব যেন একসূত্রে বাঁধা এই ভেবেই তিনি কাজ করে আসছেন। সেইজন্য, যদিও তাঁর কুকুর পোষা, ল্যাজ নাড়ে, মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে, তবুও তাঁর পরীক্ষায় কোন গলদ কেউ পায়নি, এবং তাঁর মতের একটা সামাজিক মূল্য আছে। কি করে তাঁর মত সমাজে খাটাব, সে কথা হচ্ছে না, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, অন্য বিদ্যা এখনও পেছিয়ে রয়েছে। জীবতাত্ত্বিকের প্রকৃতি-ভক্তিকে তিনি নাড়া দিয়েছেন, কিংবা ভাইসম্যানের genetic determinism-কে তিনি খণ্ডন করেছেন বলে তিনি মস্তলোক না-ও হতে পারেন। আমার তরফ থেকে তাঁর মহান কীর্ত্তি হলো এই যে, তিনি, ডারুইনের মতনই, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের মধ্যের নালাটির ওপর সেতু তৈরি করেছেন। ডারুইন্ যা করবার সুযোগ পাননি, তিনি এ যুগে বেঁচে তাই পেয়েছেন—তাঁর সেতুটি নিতান্তই mechanistic method-এ তৈরি। এ সেতুর ওপর জোর করে হাঁটা যায়, তার ওপর দিয়ে সৈন্য চালিয়ে অজ্ঞানতার রাজ্য আক্রমণ করা যায়, অর্থাৎ জ্ঞানের ভৌগোলিক সীমা বাড়ান যায়। আমার

দিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব হলো এই যে, ব্যবহারের mechanistic ব্যাখ্যা করে তার জন্য physico-chemical পদ্ধতি অবলম্বন করে, লয়েড্ মর্গ্যান্, হল্‌ডেন্ ও স্মাট্‌সের ইমারৎ তিনি ধূলিসাৎ করেছেন।

এ ত' গেল প্রাণবাদীর বিপক্ষে আপত্তি। পুরাতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্বপক্ষের উক্তিও আছে। ধরা যাক্, ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে, প্রত্যেক স্তরের বিশেষ গুণ প্রকাশিত হচ্ছে টের পাচ্ছি, কিন্তু তাই বলে নিম্নস্তরের পদ্ধতি (physico-chemical, mechanistic method) উচ্চস্তরে খাটবে না প্রমাণিত হয় কি করে? Mechanistic ব্যাখাতে কি বলে, নতুন কিছু হতেই পারে না, কিংবা যখন নতুন কিছু হয় তখন তাকে সে ব্যাখ্যা ফুঁয়ে উড়িয়ে দেয়, নেই নেই করে, সাপের বিষের মতন? রসায়নশাস্ত্রে যখন কার্ব্বনের ক্রিয়া বোঝা যায়নি, তখন অর্গানিক কেমিষ্ট্রির জন্য কি ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল? Urea-র ব্যবহারও কি তখন emergent মনে হয়নি? হেন্‌রী সাহেবের মনে হয়েছিল তাই, তবু Wohler তাকে synthesise করবার সময় তার প্রত্যেক উপাদানটি বিশ্লেষণ করেছিলেন সেই পুরাতন উপায়েই, নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনও অনুভব করেননি।

শুধু তাই নয়, স্তরই যদি মানতে হয়, তাহলে ভাল করেই মানা যাক্। অণু ও পরমাণুকেও দুই স্তরে ভাগ করা যায়, প্রত্যেকটি নিয়ে বিশেষ বিজ্ঞান রয়েছে। আবার পরমাণুর মধ্যেও ইলেক্‌ট্রোণ, তার মধ্যে প্রোটোন পদার্থ ও তার কক্ষ রয়েছে—প্রত্যেকের খেয়াল আলাদা

আলাদা সকলে বলছে। প্রত্যেকটাই নতুন বলে প্রত্যেকটির ব্যাখ্যার জন্য কি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে? তা করা হচ্ছে না। না করেও পদার্থ-বিজ্ঞান এত এগিয়ে গিয়েছে। তাহলে দাঁড়ায় এই যে, প্রত্যেক জিনিষেরই একটা বিশেষত্ব আছে,—কে এ কথা অস্বীকার করছে? কেননা, স্বীকার করলে কারুর বুদ্ধিতে টান পড়ছে না। এর মানে, প্রত্যেকের প্রত্যেকত্ব আছে। কথাটা খুব দামী নয়—tautology মাত্র। এই সব কারণেই মনে হয় emergent evolution, holism প্রভৃতি গালভরা নাম নিজেদের অজ্ঞানতা ঢাকবার আবরণ মাত্র। অজ্ঞানতা একটা মানসিক অবস্থা, যেটি fact, ব্যাখ্যা নয়। বিজ্ঞান ব্যাখ্যার একটা পদ্ধতি মাত্র, এ যুগের সব চেয়ে ভাল ও ব্যাপক পদ্ধতি। সেটা অন্য কিছু নয়। সৌজাত্য বিদ্যার বই খুলে সুপ্রজনন সম্ভব নয়, সোনার চাঁদ ছেলে কোলে আসে না—এলে পরে তার দ্বারা গুণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হয় মাত্র।

যদি ব্যাখ্যার বেলা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিতান্তই অসম্পূর্ণ হয়, প্রত্যেক স্তরে নতুন নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, (পদার্থের বেলায় এক রকম, আর মানুষের বেলায়, মর্গ্যানের মতে, dramatic, যেটা বস্তুত animistic ছাড়া অন্য কিছু নয়) তাহলে এতদিন mechanistic ব্যাখ্যার দ্বারা এতগুলি ভিন্ন ধরণের ও গঠনের ব্যাখ্যা হলো কি করে—এ-প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক যদি তোলেন, তাহলে ভাল উত্তর বোধ হয় এই বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকদের কাছে পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানের আদৎ কথা logical continuity, পদ্ধতির সাতত্য, অবিচ্ছিন্নতা। দর্শনের গূঢ় কথা প্রত্যেক বাক্যের অঙ্গীকারগুলি যুক্তিতে টেঁকে কিনা তাই দেখা। আরো ভাল করে দেখতে গেলে হয়ত নব্যন্যায়ের দরকার হবে, হয়েওছে। কিন্তু তার পদ্ধতিও কি বিচ্ছিন্ন, বিরত, সান্তর? তাও নয়। Mechanistic ব্যাখ্যার জয়-জয়কার যুক্তির সাতত্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানে সান্তরতার ছড়াছড়ি হয়েছিল, কয়েকদিন পূর্ব্বে, এখন উল্‌টো সুরও গাওয়া হচ্ছে। সে যাই হোক্, ব্যাখ্যার মধ্যে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের জগতে সাতত্য রাখতেই হবে। আমার এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে লয়েড্ মর্গ্যান্ ও হল্‌ডেনের মতের ওপর 'অক্কামের ক্ষুর' চালাবার প্রয়োজন রয়েছে।

মোদ্দা কথা এই যে, তর্কের দ্বারা mechanistic ব্যাখ্যাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আবার vitalistic, holistic কি emergent evolution-এর ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করা যায় না। Mechanistic ব্যাখ্যা, আর দর্শনের জড়ত্ব কি দেহাত্মবাদ এক নয় মানতে হয়, এবং মানলেই আপাতত বাকীটা বেশ চলে যায়। সমাজতত্ত্বে কিন্তু ঐ প্রকার physico-chemical, কি mechanistic পদ্ধতি খাটাতে পারি না। অন্যে যে কারণে খাটাতে রাজি হন্ না, আমি হয়ত ঠিক সে কারণে গররাজি নই। আমার গোলমাল বাঁধে অজ্ঞানতা, সাধনার অসম্পূর্ণতায়। পরে হয়ত সে ব্যাখ্যা সামাজিক ব্যবহারেও চলবে, কিন্তু ততদিন হয়ত বিশ্ব ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে। ততদিন কি করা যায়? এক উপায় আছে—ডি, এল্,

রায়ের বুড়োবুড়ীর ঝগড়ার মতন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের কলহকে লঘুক্রিয়া বলে ছেড়ে দেওয়া। বই পড়ে তাও পারি না, সব কিছুকেই গম্ভীরভাবে নিতে হয়, এমন কি বৈজ্ঞানিকের দার্শনিক মতকেও। এ-সব বইএর একপ্রকার সমালোচনা হচ্ছে চুপ করে রিসার্চ্চ করে যাওয়া; তাতেও কিন্তু ঘাম ঝরে। সেইজন্য সন্দেহ-দোলাতেই দুলতে হয়।

পাকা মাতালরা সকাল বেলা আর এক চুমুক টেনে গত রজনীর উচ্ছৃঙ্খলতার খোঁয়াড়ি ভাঙে। মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করে, ক্যালভারটনের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। মতটাকে রীতি নীতি ও মতির মতনই দরকারি মনে করা সমাজতাত্ত্বিকের নেশা ও পেশা। লোকে কেন একটি মত ছেড়ে অন্য মত বরণ করে আমাদের দেখতে হয়। তাই দেখাতে গিয়ে ভদ্রলোক বলছেন, cultural complex-এর পিছনে যে শক্তি কাজ করে সেটা শ্রেণীগত স্বার্থের। "It is not what has usually been called the truth of their doctrine which makes them so powerful, but their adaptability to other interests, class-interests in the main, which they subserve. It is these other, these more basic, interests that turn these ideas into cultural compulsives." "The cultural compulsive represents the group-interest in its psychological form"। এ মন্তব্যে অনেকটা সত্য নিহিত রয়েছে। বিবাহের উৎপত্তি সম্বন্ধে ওয়েষ্টার-মার্কের মতামত ভিকটোরীয়ান যুগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের

মনোমত হয়েছিল বলেই তার বহুল প্রচার হলো, আবার ঐ সম্বন্ধে মর্গ্যানের মত সোশিয়ালিষ্টরা গ্রহণ করলো নিজেদের শ্রেণীর আশানুযায়ী সম্পত্তিবিভাগের সমর্থন হয় বলে। আজ যদি পৃথিবীতে অর্থকষ্ট না থাকত, তাহলে কার্ল মার্কসের ইকনমিক ব্যাখ্যা কেউ গ্রহণ করত কি? মনঃকষ্ট পেলে লোকে ধার্ম্মিক হয়, সে মনঃকষ্টের প্রকৃতির উপর ভগবান সাকার হবেন কি নিরাকার হবেন নির্ভর করে। তার উপর আবার মানুষের স্বভাবে চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। বহির্মুখী না হলে হগ্‌বেনের publicist point of view গ্রহণ করা যায়? আমেরিকাতেই ওয়াট্‌সন্, মিলিক্যানের আশার বাণী, বেলজিয়মেই লেমায়তার-এর দুঃখবাদ, যুদ্ধক্লান্ত ও অর্থক্লিষ্ট পৃথিবীতেই এডিংটন্, জীন্‌সের মত খাপ খায়, আর ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তের মধ্যে তাঁদের মতের প্রচলন হওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়। যে কোন মতের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মতৃপ্তি, ভয়ভাবনা, আশাভরসা প্রভৃতি বাজে জিনিষের খাদ এত মেশান থাকে যে, তার কতটুকু সত্য, আর কতটুকুই বা মিথ্যা বলা একরকম অসম্ভব। হগ্‌বেনের ভাষায় বলতে গেলে, কাঠগড়ায় এখনও মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিচার এখনও চলছে, রায় বেরোবার আগে ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা নিয়ে অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করলে Contempt of Reason হবে। ইতোমধ্যে সিদ্ধান্তে না আসা ভদ্রমনের চিহ্ন মনে করে আত্মতৃপ্ত হওয়া যাক্।

সন ১৩৩৮

নর্ম্মাল

মাষ্টারি করতে গেলেও অনেক বিপদে পড়তে হয়। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ হচ্ছে, পরের মুখে ঝাল খেয়ে আপ্ রুচির সর্ব্বনাশ করা। অথচ এ কাজ করতেই হয়, না করলে চাকরী থাকে না। ভাগ্যিস আমার বাংলা লেখা আমার কর্ত্তারা পড়েন না তাই এ প্রবন্ধ লিখতে সাহসী হচ্ছি। মাতৃভাষার সাহায্যে আমি আত্মরক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছি। আগে সাহেব-লোক যা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতেন তাই প্রগাঢ় ভক্তি-সহকারে পড়তুম এবং তাই বিশ্বাস করতুম। তাই পূর্ব্বে হট্টমনের উপর আস্থা ছিল, এখন আর নেই।

আমার বর্ত্তমান রুচিবিকারের একটি ইতিহাস আছে। যখন সেকেণ্ড ক্লাসে হেয়ার স্কুলে পড়ি, তখন হঠাৎ সাহিত্যিক হয়ে উঠি। রসজ্ঞানের বিকাশ হলো কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে কম নম্বরে। অমনি আমরা জনকয়েক রসিক মিলে এমন কয়জন মহাজনের তালিকা প্রস্তুত করলুম, যাঁদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন অঙ্কশাস্ত্রে কাঁচা হয়েও জগতের মহৎ উপকার সাধন করে গিয়েছেন। অঙ্কের মাষ্টারমশায়কে ঐ তালিকাটি দেখাবার পরের দিনই তিনি আর একটি তালিকা প্রস্তুত করে এনে দেখালেন, যার মধ্যে শতকরা একশ' জন মহারথীই অঙ্কের জন্যই মহৎ হতে পেরে ছিলেন। আমার বেশ মনে পড়ে যে, আমাদের সাহিত্যিকবৃন্দ তালিকাটি দেখে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন, এমন কি ঐ দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত মহারথীদের জীবন-রচয়িতার সাক্ষ্য সন্দেহ

করবার সাহস পর্য্যন্ত কারো হয়নি। কিন্তু তখন থেকে মনে এই একটা প্রশ্ন উঠল যে, একটি তালিকার সিদ্ধান্ত অন্য তালিকার সিদ্ধান্ত হতে পৃথক কেন, এবং আমার ইচ্ছার প্রতিকূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার বাধ্য-বাধকতা কোথায়?

যখন স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রবেশ করি, তখন ভেবেছিলাম যে, বড় বড় পণ্ডিতের কাছে আমার ছেলেমানুষী সন্দেহের নিরাকরণ হবে। অঙ্কে কাঁচা হয়েও বিজ্ঞান পড়তে উদ্যত হই, যেমন সকলে করে। প্রথম দিনই বিজ্ঞানের অধ্যাপক বল্লেন, "বিজ্ঞান পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সৃষ্টি করা। বাঙ্গালী জাতি বড় ভাবপ্রবণ। প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবকই সাহিত্য, দর্শনের দোহাই দিয়ে মিথ্যাকল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। তাই তাদের মুখে তত্ত্বকথাই শোনা যায়। সেইজন্য, এই জাতীয় দুর্ব্বলতার উচ্ছেদকল্পে বিজ্ঞানের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় কথা এই যে, সাহিত্যে, দর্শনে, একটি এমন বৈজ্ঞানিক মান নেই, যার দণ্ডে ভালমন্দের ওজন হতে পারে। রবিবাবু ভাল কিংবা মন্দ কবিতা লেখেন, তা নির্ণয়ের মানদণ্ড কোথায়? আর সেইটি না থাকার দরুণই সাহিত্যিক-তর্কের মেরুদণ্ড থাকে না। ফলে জাতিও দুর্ব্বল এবং কল্পনাশীল হয়ে পড়েছে। আমাদের বিজ্ঞান কিন্তু এলোমেলো তর্কের প্রশ্রয় দেয় না।" তারপর শিক্ষক মহাশয় বল্লেন, "এই দণ্ডকেই আমরা নর্ম্মাল বলি। রসায়নশাস্ত্রে, এতখানি আয়তনের বস্তুতে জল মিশিয়ে হাজার c. c. আয়তনে পরিণত করলে সেই জলীয় পদার্থকে নর্ম্মাল সলিউসন বলা যায়। যখন

তোমরা হাতে কাজ করতে আরম্ভ করবে, তখন সব দ্রব পদার্থকেই তার নর্ম্মালের সঙ্গে তুলনা করতে হবে।” বক্তৃতা শুনে, বাঙ্গালীজাতির কলঙ্কমোচনে তৎপর হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু পরীক্ষক-সম্প্রদায় দেশাত্মবোধের কদর করলেন না। সেইজন্য বোধ হয় এখনও বুঝতে পারিনি কোন্ খেয়ালে বৈজ্ঞানিক-নর্ম্মালের সৃজন হলো।

তারপর কিঞ্চিৎ দণ্ড দিয়ে বি, এ, ক্লাসে অর্থনীতি এবং রাজনীতি নিলাম। অর্থশাস্ত্রের প্রথম কথাই আবার সেই নর্ম্মাল-মূল্য। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখলাম যে, নর্ম্মাল-মূল্যের অস্তিত্ব শুধু মার্শ্যাল সাহেবের মাথায়, নচেৎ দর কষাকষিতেই দাম ধার্য্য হয়, এবং সেই কার্য্যে অনেকখানি মনের ক্রিয়া আছে। রসায়নশাস্ত্রে যখন প্রত্যেক বস্তুর নিজের নর্ম্মাল আছে, তখন বাজারে কেন প্রত্যেক মানুষের নিজের নর্ম্মাল থাকবে না? মার্শ্যাল সাহেব উত্তর দিলেন যে, “সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই অভাব আছে, সে অভাব পূর্ণ করবার চেষ্টায় সে সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই অভাব-গুলিকে এবং অভাবপূরণের পন্থাগুলিকে থরে থরে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকভাবে সাজালে একটি ল, সা, গু, পাওয়া যাবে, সেটি একটি স্বার্থপর জীবের স্বার্থাভিসন্ধি। এই জীবটির সাধারণ এবং স্বাভাবিক ব্যবহার আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে, তিনি সর্ব্বদা নর্ম্মাল-মূল্যে পণ্যদ্রব্য কিনছেন এবং বেচছেন।” অর্থাৎ নর্ম্মাল-মূল্য নর্ম্মাল জীবেরই মূল্যনির্দ্ধারণ, রক্তমাংসের জীবের নয়।

নর্ম্মাল কথাটির মানে কি? এর খানিকটা গড়পড়তা, খানিকটা স্বাভাবিক এবং খানিকটা আদর্শ। প্রথমেই

প্রত্যেকের বিশিষ্ট অ-স্বাভাবিকত্বটুকু বর্জ্জন করতে হবে। তারপর প্রত্যেকের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকে একত্র সাজাতে হবে। তখন অবস্থাভেদে ব্যবহার ভিন্ন হবে বটে, কিন্তু সে বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যেও একটি কার্য্যগত সামঞ্জস্য টের পাওয়া যাবে। অতএব এর ভিতর ধর্ম্ম নেই, নীতি নেই; আছে শুধু ক্ষেত্রকর্ম্মানুসারে বিধান এবং নিয়ম। এই হলো বৈজ্ঞানিকের প্রথম নির্ব্বাচনের ফল। এখন, অনেকগুলি নর্ম্মাল আছে। পরে, বহু নর্ম্মালের সামান্যীকরণে 'একটি' বৃহৎ নর্ম্মালের সৃজন হবে, যার পরে আর কোন কথা নেই। কিন্তু যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আলোচনা নিবদ্ধ থাকবে, তখন সেই অবস্থার নর্ম্মালই সেই অবস্থার ব্রহ্ম।

যথা, অ্যানাটমিতে রোগা মোটা হাড়ের অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু 'হাড়ের'; অর্থশাস্ত্রে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন বন্ধুর স্থান নেই; ডাক্তারীতে যেমন কেবল রোগী আছেন, সুস্থসবল কেউ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র হাড়, কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বা, এবং কেবলমাত্র অসুস্থ ব্যক্তি চোখে পড়ে না। চোখে যা পড়ে সেটি হয় রোগা নয় মোটা হাড়, এবং একই ব্যক্তি কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী, কখনও সহায়, কখনও রুগ্ন, কখনও সবল। বাস্তব জগতে নর্ম্মালের অস্তিত্ব নেই। 'মাথা নেই তার মাথা ব্যথা' বলে আমরা নর্ম্মালকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছি শুনে বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন 'নেই তাই পাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে?' অবশ্য নর্ম্মালের আবশ্যক আছে, যদিও সেটি বৈজ্ঞানিক-প্রয়োজন। এ না হলে জ্ঞানের দানা

বাঁধে না। প্রত্যক্ষ অস্তিত্বই শেষ কথা নয়, পরোক্ষ উদ্দেশ্যকেও মানতে হবে।

জ্ঞানই শক্তি। সে শক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে চিরজীবী হয়ে থাকা। জ্ঞানের দ্বারা যদি ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, তাহলেই জ্ঞান সার্থক হলো। মাঝিমাল্লারা জোয়ারভাটা, মেঘ ঝড় রোজ লক্ষ্য করে করে বলতে পারে কখন্ জোয়ার-ভাটা আসবে এবং কখন্ নৌকা ছাড়লে ঝড়ের আগেই নদীর ওপারে পৌঁছতে পারা যাবে। দৈবজ্ঞ রাজার হাত গণনা করে বলে দিলেন যুদ্ধে জয়লাভ নিশ্চিত; জয়লাভ যদি হলো, ব্রাহ্মণ হলেন মন্ত্রী; হার যদি হলো, ব্রাহ্মণ টুলো পণ্ডিতই রয়ে গেলেন। আজকালকার বৈজ্ঞানিক সেই পুরাতন দৈবজ্ঞেরই বংশধর, তাই কত বৎসর পরে কোন্ মুহূর্ত্তে ধূমকেতু আসবে, এখন থেকেই অঙ্ক কষে বলে দিতে পারেন। সোনারূপার দাম বাড়বে কি পড়বে, অর্থশাস্ত্রীর দল এক বছর আগেই তা কাগজে ছাপিয়ে দিতে পারেন। আবার জনকয়েক সমাজতত্ত্ব-বিশারদ কোন বিশেষ সমাজের লোকসংখ্যাবৃদ্ধি এবং হ্রাসের হার দেখে সেই সমাজের পতন, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত বাৎলে দিতে পারেন। তবে এঁদের কথাগুলি ঠিক ফল্‌ছে না, তাই খাঁটি বৈজ্ঞানিক এখনও সমাজতত্ত্ববিদ্‌কে বিজ্ঞানের আসরে রূপার আসনেই বসিয়ে রেখেছেন, সোনার সিংহাসন দেননি।

প্রকৃতিকে বশ করাই হচ্ছে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সেই বশীকরণের মন্ত্র হলো নর্ম্মাল। জোয়ারভাটার গতি যে মোটে একশ' বার লক্ষ্য করেছে তার ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষা যে হাজার বার লক্ষ্য করেছে তার বাণীই সফল হবার

সম্ভাবনা বেশি। যে আবার আরো বেশি বার লক্ষ্য করেছে, সে-ই জোয়ারভাটার স্বাভাবিক, সাধারণ গতি বলে দিতে পারে, কেননা সে-ই জোয়ারভাটার অসাধারণ, অস্বাভাবিক আচরণগুলি স্বচ্ছন্দে বাদ দিতে পারে। তারপর যে নিয়মটি নির্ণীত হলো, সেইটি নর্ম্মাল গতি। অতএব নর্ম্মাল সৃষ্টির পূর্ব্বে একটি হিসাব-নবিসকে ডাকতে হবে ষট্‌কে পড়বার জন্য, যোগবিয়োগ করবার জন্য। নর্ম্মাল সৃষ্টির পরও তাঁর কাজ আছে। তাঁকে গুণতে হবে কয়টি বস্তু কিংবা কার্য্য নর্ম্মালের সঙ্গে মিলছে। কতখানি গরমিল হলো ওজন করা, কিংবা গরমিলকে খাতির করাও তাঁর কাজ। যে বিজ্ঞান যত উৎকৃষ্ট, সেটি তত সংখ্যামূলক, তার গরমিল তত কম। সমাজতত্ত্বে এই গরমিল বেশি।

কিন্তু নর্ম্মাল সৃজনে এবং সংখ্যাগণনে কতখানি যে বাদ পড়ে গেল, তা বৈজ্ঞানিক না বুঝলেও প্রত্যেক মানুষেই বোঝে। এক ছাঁচে গল্‌তে গিয়ে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্য হারালো। 'প্রত্যেক' হচ্ছে খামখেয়ালী, অবিবাহিত যুবকেরই মতন। খেয়ালও গেল। অথচ বৈচিত্র্য এবং খেয়াল, সৃষ্টির এক একটি প্রধান উপকরণ। বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে হয়ত সনাতনকে পাওয়া যায় কখন কখন। কিন্তু সনাতনের সন্ধানে সত্যের আভাস হারিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা সর্ব্বদাই রয়েছে। সনাতনের খাতিরে সত্যের অঙ্গহানি করবার অধিকার বৈজ্ঞানিকের নেই। তারপর, এই সাধারণ ও সনাতন আদর্শ মানতে গিয়ে, প্রত্যেকের কর্ম্মের ভিতর, জীবনের পরতে পরতে যে আদর্শ ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে, তাকে কি অবমাননা করা

হলো না? বৈজ্ঞানিকের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হয়ত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অন্তর্নিহিত আদর্শের পরিপন্থী না-ও হতে পারে। কিন্তু শেষে তাই দাঁড়ায়। তখন সেই নৰ্ম্মাল পদার্থটি কেবল বৈজ্ঞানিকেরই দেবতা হবার উপযুক্ত, কিন্তু সত্য উপলব্ধির পক্ষে অপদেবতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সংখ্যার আধিক্য দেবত্বের দিকে নৰ্ম্মালকে, সাধারণকে, এগিয়ে দেয়, এবং ব্যক্তিগত মোটা মোটা পার্থক্যকে মিহিন্ করে দেয়।

যে সব বিজ্ঞান কেবলমাত্র সংখ্যামূলক এবং নিরালম্ব, সংখ্যাই তাদের নৰ্ম্মাল, বিশেষ করে একক এবং শূন্য। কিন্তু বস্তুবাচক বিজ্ঞানে, যেমন পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়নশাস্ত্রে, একটি নৰ্ম্মাল বস্তুর প্রয়োজন হয়, যদিও সেটির সৃজন এবং উদ্দেশ্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে—সংখ্যাই তার শৃঙ্খল। এই দুই প্রকার বিজ্ঞানেই নৰ্ম্মাল কেবলমাত্র ক্রিয়াসাধক যন্ত্র মাত্র। এ ইন্দ্রিয়রহিত অজীব জগতের কথা। কিন্তু ইন্দ্রিয়রাজ্যে ওঠবার মুখেই যে সব বিদ্যার প্রয়োজন হয়, যেমন প্রাণিতত্ত্ব, তখনই গোলমাল বাধে। এখানে অন্ততঃ দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির নৰ্ম্মাল চাই। কেননা জীববিদ্যা রসায়নশাস্ত্র এবং দেহতত্ত্বের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। বিপদ আরো ঘনিয়ে ওঠে সেই সব বিদ্যায়, যেখানে ব্যক্তি নিয়ে, প্রাণ নিয়ে কারবার। ব্যক্তির ক্রিয়াপদ্ধতি প্রথমে তার মনের এবং দেহের উপর, দ্বিতীয়ত তার দেশ এবং দেশস্থ জীবজন্তু, মাটি, আবহাওয়ার উপর, এবং তৃতীয়ত তার কালের এবং ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশ কালের প্রাণ নেই, সেইজন্য সমাজতত্ত্ববিদ্, অর্থশাস্ত্রী ও রাজনৈতিক এই জড়ের নৰ্ম্মাল তৈরি করতে তত গোলে পড়েন না, যত

গোলে পড়েন একটি নর্ম্মাল মানুষ গড়তে। আমরা অর্থনৈতিক জীবটির সহিত পরিচিত। রাজনৈতিক জীবটিও ঠিক একই উপায়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে এ জীবটি পৃথক, কেননা অন্যান্য ব্যক্তি ভোট দেওয়া ছাড়াও অন্য কাজ করে; কিন্তু রাজকীয় ব্যক্তির একমাত্র ক্রিয়া ভোট দেওয়া এবং নেওয়া। রাজকীয় জীবটি তাহলে রাজকীয় কার্য্যের পক্ষে নির্গুণ; অন্ততঃ বৈশিষ্ট্য, উন্নতিশীলতা প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণের ধার এ জীবটি ধারে না। এর বুদ্ধি বিবেচনার লক্ষণ শুধু প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে, তবে অনেক বুদ্ধিমানের দেশেও এ কাজটি টিকিট দিয়েই সম্পন্ন হয়। এই নির্গুণ জীবটির সঙ্গে যাচিয়ে নিতে হবে রক্তমাংসের জীবকে। এই সাংঘাতিক পরীক্ষায় যত সংখ্যক ব্যক্তি পাস হলেন, তাদের একটি দল হলো; সঙ্গে সঙ্গে ফেল করার দলও আর একটি হলো। যদি পূর্ব্বোক্ত দলের সংখ্যা পরোক্ত দলের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হয়, তবে কেবলমাত্র সেই নর্ম্মাল-নির্ব্বাচিত সংখ্যার আধিক্যই দেশের ভবিষ্যৎ কাজের উপযুক্ত কে হবেন ঠিক্ করলেন। এখন নর্ম্মাল কি করে দল বাঁধতে পারে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। নর্ম্মাল ত নির্গুণ এবং অবাস্তব। কিন্তু দল একটি খাঁটি বাস্তব জিনিষ, এবং দলের গুণের বালাই নিয়ে আমরা সকলেই মরে আছি। নর্ম্মালের প্রাণ চাই। এখনও ন্যায়ত, ধর্ম্মত, বৈজ্ঞানিক নিরহঙ্কার হতে বাধ্য, কেননা তাঁর অহঙ্কার সংখ্যার ক্ষুরে পেতে দিয়েছেন। তাই তিনি বল্লেন, এই যে নর্ম্মালে আবদ্ধ দলটি, এটি আমার রচনা নয়, এর নিজের প্রাণ মন সব কিছুই আছে। সবই সংঘমনের সৃষ্টি, তবে সাধারণ মানুষ নিজের গর্ব্বে

স্ফীত হয়ে সংখ্যাকে তাচ্ছিল্য করে, এবং সংঘমনকে বুঝতে না পেরে নিজের মনকেই প্রধান করে দেখে। কিন্তু বস্তুত সংঘমন টালার চৌবাচ্চার মতন, ব্যক্তি এক একটি কলতলার নল বইত নয়। অবশ্য এ সব সমাজ-তত্ত্ববিদের কথা, বাস্তব জগতে তিনি হয়ত অতখানি বিনয়ী না-ও হতে পারেন। মন প্রাণ যখন পাওয়া গেল, তখন সেই নর্ম্মাল-হট্টমনের নর্ম্মাল-পদ্ধতি পাওয়া শক্ত কথা নয়। সমস্ত বিজ্ঞানের নর্ম্মাল-বস্তু এবং নর্ম্মাল কার্য্যগত সম্বন্ধগুলিকে একত্র করে তার ল, সা, গু, করে নিলেই সংঘমনের কার্য্যপদ্ধতি টের পাওয়া যাবে। সেই পদ্ধতিই হবে আদর্শ, এবং তার থেকে বিচ্যুত হবে শুধু পাষণ্ডের দল।

আমাদের সমাজে আমরা এতদিন নর্ম্মাল মন্ত্রটি জপ করে এসেছি। আমাদের ঋষিরা ছিলেন একাধারে পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিক। তাঁদের রচিত সমাজ 'জার্ম্মান-পসন্দ্'। সে বন্দোবস্ত একটি নর্ম্মালের উপরই স্থাপিত। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর থেকে আমরা—অর্থাৎ B. Sc., M. Sc.-র দল এবং সেই পুরাতন আর্য্য-বৈজ্ঞানিকদের বংশধর,—সকলে অতি গম্ভীরভাবে রাজনীতির ছাত্র হয়ে উঠেছি। এতদিন পরে আমরা একটি রাজকীয় নর্ম্মাল আবিষ্কার করেছি। এর পূর্ব্বে আমরা শুধু মানুষের মাথাই গুণে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আজ দল পাকা হলো, কেননা সেই দলের একটি মনও আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই দলের একটি নেতা বলছেন, এই সংঘমনের কাছে আত্মসমর্পণ কর—দু'দিন পরে অবশ্য বলবেন যে, সংঘমনই একমাত্র মন। কিন্তু সে সাহস এখনও হয়নি। এখন তিনি

উপায়মাত্র বলে দিচ্ছেন যে কি করে আত্মবলি দিতে হবে। তার নাম discipline, অর্থাৎ জার্ম্মান-ড্রিল।

আমার মনে হয় যে, হট্টমন-রূপ নতুন একটি মন্ত্র জপ করার ফল অন্যান্য নামজপের মতনই সুখের হবে—অর্থাৎ সেই নাম জপ্‌তে জপ্‌তে আমরা ঘুমিয়ে পড়ব।

হয় অনুমোদন করেন, না হয় পেস্ করেন। কিন্তু আজ অনেক বৈজ্ঞানিক একমাত্র সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই বিনয়ী হয়েছেন। বিনয় এতদূর গড়িয়েছে যতদূর যাওয়া হয়ত বুদ্ধির আদেশাতিরিক্ত। এই সব বৈষ্ণবী, যোগী বৈজ্ঞানিকের বিনয়োক্তি উদ্ধৃত কোরে আমাদের দেশের অন্ধকার-বিলাসী, গুহাবাসী স্বদেশভক্ত বৃদ্ধ ও যুবকের দল অত্যন্ত আত্মতৃপ্ত হয়ে উঠেছেন। তার চেয়ে ঐ বিদেশী বিনয়ী বৈজ্ঞানিকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের বুদ্ধিকে নিষ্ঠুরভাবে যাচিয়ে নিয়ে অনেক কাজ হোত।

মোদ্দা কথা এই, এমন অভিজ্ঞতা আছে যার উপলব্ধি একমাত্র মার্জ্জিত বুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব, এবং সেই অভিজ্ঞতার সংখ্যা বেশি, মূল্যও কম নয়। বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি এবং অঙ্কশাস্ত্রের শাসন ভিন্নও বুদ্ধি মার্জ্জিত করা সম্ভব। সে মার্জ্জনা-পদ্ধতি খুব কঠোর হওয়া চাই। আমি মানি যে, ঐ ধরণের অভিজ্ঞতা না অর্জ্জন কোরলে জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার থেকে প্রমাণ হয় না যে, সেই অভিজ্ঞতাই একমাত্র সত্য, এবং সেই অভিজ্ঞতাই অন্য অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ করে, কিংবা তাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করে। মাথার ওপর টালার চৌবাচ্চার মতন একটা Libido, Universal spiritual ঐশী-শক্তি, Selfish Ego, Group-mind, Over-soul, Mind-stuff মানতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি নল মনে কোরতে হয়। আমি কেবলমাত্র নল হোতে গর্‌রাজী—তা ভগবানেরই হোক্ আর সমাজ-মনেরই হোক্। আমিই আমার কাছে সব চেয়ে

মূল্যবান বস্তু। টালার কর্ত্তাদের হাতে আত্মসমর্পণ কোরতে হয়, নিকটে নদী নেই বোলে। কিন্তু মানুষের জীবন একটি স্রোতস্বিনী। নদী সমুদ্রে পড়ে, সমুদ্রের লোণা জলও বুকে টেনে নেয়। নদীতে জোয়ারভাটা সবই আছে। নদীতে অবগাহন কোরলে পুণ্য হয়, কলতলায় নাইলে কাজ চলে, কিন্তু মানুষের সত্য সত্যই জাত যায়। জীবনের বৈচিত্র্য মানলে সব বিজ্ঞানের, সব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে স্বীকার কোরতে হয়। বোধি যদি মার্জ্জিত বুদ্ধিই হয়, তাহলে অবশ্য তার প্রাধান্য মানলেই অন্য ইন্দ্রিয়কে অগ্রাহ্য করবার প্রয়োজন থাকে না।

এই সাধারণ বুদ্ধি, যেটি ব্যবহারিক জগতে খাটে, যার দ্বারা ভালমন্দ বিচার করা যায়, যার দ্বারা ভাল কবিতা, গান, ছবি উপভোগ করা যায়, যেটি বৈজ্ঞানিকেরা খাটাতে চান্, তাকে সম্প্রসারণ ও মার্জ্জিত কোরলে কোথায় গিয়ে পোঁছান যায় তা লিওনার্দোর জীবনে বেশ দেখা যায়। এই পরিমার্জ্জনকে পল্ ভালেরি 'a process of perpetual exhaustion, of detachment without rest or exclusion from everything that comes before it whatever the thing may be' বোলেছেন। বুদ্ধির দ্বারা যেখানে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি উপনীত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা কোরতে গিয়ে ভালেরি এই সব ভাষা ব্যবহার কোরেছেন :—যেখানে "itself and X, both of them abstracted from everything, implicated in everything, implicating everything equal and con-substantial"···"the point of pure being,"

যেখানে "there is no act of genius which would not be less than the art of being. He is the I" ইত্যাদি। এ অবস্থা কি কোন মিষ্টিকের বাঞ্ছিত অবস্থা হোতে ভিন্ন? সকলেই জানেন যে, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের দ্বারাই লিওনার্দো এই অবস্থায় এসেছিলেন।

এই লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির জীবন একদেশদর্শী মিষ্টিকের জীবন অপেক্ষা আমার কাছে বেশি মূল্যবান। এ জীবনে বিজ্ঞান আছে, সাধারণ বুদ্ধির স্ফুরণ আছে, অতিপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বদলে মার্জ্জিত বুদ্ধিলব্ধ নতুন অভিজ্ঞতা আছে এবং এক কাম ভিন্ন (ফ্রয়েডের মতের বিপক্ষেই এ কথা লিখছি) অন্যান্য অভিজ্ঞতার যথার্থ মূল্য দেওয়া হয়েছে। এই আন্তরিক সাম্যের একটি "deep note of existence"-এ তিনি যে-হাতে ঘা দিয়েছিলেন, সেই হাতে মনা লিসার ছবি, আবার বিস্তর কলকব্জার নক্সাও এঁকেছিলেন। তিনি সেই হাতে ঘোড়ার খুর পর্য্যন্ত বেঁকাতে পারতেন। তাঁর প্রতিভা সাধারণ বুদ্ধিকে মার্জ্জিত কোরেই তাকে অতিক্রম কোরেছিল, এবং সাধারণের বোধগম্য উপায়ে বিকশিত হয়েছিল। লিওনার্দোর সব ছিল, ছিল না শুধু মনের আলস্য। তার মন্ত্র ছিল Obstinate Rigour— এই মন্ত্র কয়জন মিষ্টিক্ জপ করেন? যাঁরা করেন তাঁরা আমার নমস্য। আমার মতে সকলের এই মন্ত্র জপ করবার সময় এসেছে, বিশেষত আমাদের দেশে।

হয়ত আমার প্রবন্ধের নাম "যোগধর্ম্মের যুক্তি" ঠিক হয়নি। মিষ্টিসিজ্‌ম্ আর যোগধর্ম্ম এক বস্তু না

হোতে পারে। কিন্তু এই প্রবন্ধে যদি কোথাও 'যোগ' কথাটি উল্লেখ কোরে থাকি, তাহলে মিষ্টিসিজমের অর্থেই ব্যবহার কোরেছি। যোগ সম্বন্ধে কিছুই জানি না, যা জানি তাও বই পড়ে। অবশ্য যোগীর মতে তাতে কিছুই জানা যায় না। আমার লেখার ভেতর যদি কোন শ্লেষ ও অশ্রদ্ধাসূচক ভাব ফুটে থাকে তাহলে সেটি আমার জনান্তিকে। প্রবন্ধটি লিখেছি কেবল আমার নিজের মত সাজাবার জন্য—এমন কি পরকে গালাগালি দেবার জন্যও নয়। আশা করি, পাঠকবৃন্দ (আমার প্রবন্ধের কোন পাঠিকা নেই) আমার বক্তব্যটি শুনে আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা কোরবেন।

যুগধর্ম্মের অন্যদিক

পৌষ সংখ্যার 'জয়ন্তী'তে আপনার 'খোলা চিঠি' পড়লাম। বাদানুবাদের বিষয়টি নিতান্তই গুরুগম্ভীর— আমার প্রতিবাদ নাতিদীর্ঘ চিঠিতে পরিস্ফুট হবে না ভয় হচ্ছে। তবুও চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই।

এক এক সময়ে মনে হয়, বুঝিবা মনের খাম্-খেয়াল অনুসারে যত সব দৃষ্টি-ভেদ। অন্তত, মেজাজ ভিন্ন বলে একই উদ্দীপনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। এই দেখুন না, আমার 'সমাজ ও সন্ন্যাস-গ্রহণ' পড়ে আপনার ভালো লেগেছিল, তার মধ্যে আপনি 'দৃঢ়চিত্ততা ও যুক্তিবত্তা'র পরিচয় পেয়েছিলেন—আবার প্রমথবাবু পেয়েছিলেন বন্ধুর প্রতি অভিমান—দিলীপকুমার পেলেন, রাগ ও দ্বেষ। আর যে 'যোগধর্ম্মের যুক্তি' পড়ে আপনি 'apologetic tone-এর রেশ' পান, সেইটে পড়ে অনেকের মন্দ লাগেনি, এক-আধজন আবার তাতে যুক্তিবত্তারই প্রমাণ পেয়েছিলেন। আবার দেখুন, আপনার মনে হয়, "চিন্তার ক্ষেত্রে এই তপোবনের আদর্শকে একালে পরম বলিয়া চালাইতে যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াস পাইয়াছেন সেখানে সত্য ও কল্যাণের আকর্ষণ তাঁর শিথিল" হয়েছে। আমার মনে হয়, তাঁর আদর্শ কখনও তপোবনের ছিল না, তিনি বরাবরই আশ্রম-ধর্ম্ম বলতে লোকে যা বোঝে তার বিরোধী, কেবল গান্ধী-যুগের পর নয়। তিনি তপোবনের ছবিই এঁকেছেন, এবং Message of the Forest-এও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার একটি মূল কথার ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি সে আদর্শ কেন,

কোনো আদর্শই 'চালাতে' চেষ্টা করেননি, এবং কোনো তত্ত্বই তাঁর কবিত্ব-শক্তিকে হীন করতে সক্ষম হয়নি। অতএব, আপনার পক্ষে, 'সে তত্ত্বের উপজীব্য যে হইবে মধ্যযুগীয়তা' এই সিদ্ধান্তে আসা যেমন স্বাভাবিক, আমার পক্ষে ততটা নয়। তপোবনকে মধ্যযুগে না ছুঁড়ে ফেলে, এবং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র লেখা বিচার করে, (দু'চারটা লাইন তুলে নয়,) যদি প্রমাণ করতেন যে তাঁর আদর্শ তপোবনের, এবং বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার বিরোধী, তবেই ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমার পক্ষে সহজ হোত। আপনি আবার লিখেছেন, "সত্যানুভূতির তীব্রতা অগভীর হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্প-প্রতিভাও শ্রান্ত হইয়া আসিবে আশ্চর্য্য কি"। আমার পক্ষে এটা খুবই আশ্চর্য্যের কথা। আমার বিশ্বাস, বয়সের সঙ্গে তাঁর সত্যানুভূতি বেড়েছে এবং শিল্প-প্রতিভা হীনপ্রভ হয়নি। টলষ্টয়ের হয়েছিল, অতএব রবীন্দ্রনাথের হোতে হবে, এ আমি মানি না। 'অতএব' আপনি লেখেননি, কিন্তু সেটা উহ্য রয়েছে সন্দেহ হয়। আশা করি, সন্দেহটি অমূলক। আপনার চিঠি হোতে এই ধরণের অনেক দৃষ্টান্ত তোলা যেতে পারে। অবশ্য তাই থেকে, অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ার ও সংস্কারের পার্থক্যজনিত সিদ্ধান্ত-বিভিন্নতা থেকে প্রমাণ হয় না যে, 'আমার ও আপনার মধ্যে যে প্রভেদ সে আমাদের মনের প্রস্থান-ভূমির প্রভেদ, অতএব তর্ক অচল।' মনের ক্রিয়া একটু পৃথক বলে প্রতিক্রিয়া আলাদা—জোর এই প্রমাণ হয়। তর্ক বেশ ভালো রকমই চলতে পারে। বিলেতের চরমপন্থী ও নরমপন্থী উভয় দলই পার্লামেন্টের প্রভুত্ব স্বীকার

করে, তাই তাদের মধ্যে ভীষণ তর্ক চলে। আমরা দু'জনেই যুক্তির প্রাধান্য, ভদ্রতার সুবিধা মানি, তাই তর্ক বেশ চলবে বিশ্বাস করি।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমার মনের গঠন কি? আমি উত্তর দেব, আপনিই আমার চেয়ে বেশি জানেন। গঠনটা কি নিজে জানি না, কিন্তু অন্য মনের ক্রিয়াকলাপ দেখলে বুঝতে পারি যে কোথাও না কোথাও কি একটা পার্থক্য রয়েছে। যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কি? তাহলে বিশদ করে বলতে পারব না, শুধু ইঙ্গিত দেবো। আপনার মধ্যে কর্ম্মপ্রবণতা আছে, আমার মধ্যে ওসব বালাই নেই, আপনি যুগকে, কালকে শত্রু ভেবে জয় করতে চান এবং যাকে অতিক্রম করে জয় করেছেন বিবেচনা করেন তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন; আর আমি কালস্রোতে ভেসে বেড়াতে অনিচ্ছুক হয়েই ঠিক করেছি যে কাল কিংবা যুগধর্ম্ম সমাজেরই তৈরি জিনিষ। মানুষে কি ভাবে এই কালকে বোঝে তার সঙ্গে তার ধর্ম্ম অর্থাৎ মানসিক গঠনরীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

আমাদের তর্কের প্রধান বস্তু ছিল যুগধর্ম্ম এবং তারই সংক্রান্ত কোনো বিশেষ যুগের মনোভাব। আমার মতামত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নেই। আপনার মতামত আবার এখন জানলাম। আমার সন্দেহ হয়েছে যে, আপনার মতামতের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত বিরোধ রয়েছে। দুই স্থান থেকে দুটি তিনটি মন্তব্য সাজাচ্ছি :—"কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভ্যতা বলিয়া কোন কিছু আছে কি? ইসলামিক সভ্যতা কথাটির মতন ইহাও vague নয়?" "তবুও

একি সত্য নয় যে, শীত বসন্ত বর্ষা এ সব পৃথক ঋতু, আর ইহাদের ধর্ম্মও পৃথক?" আবার, "সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত কালকে মোটামুটি তিনযুগে ভাগ করা হইয়া থাকে—আদিযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ।" তারপর আপনিই প্রত্যেক যুগের বিশেষ ধর্ম্মও ব্যাখ্যা করেছেন। আপনার আপত্তি কোথায়, গজ-কাঠিতে না ঘড়ির কাঁটায়, ভূগোলে, না যুগে? ঐ যে 'তবু' ও 'মোটামুটি' কথা প্রয়োগ করেছেন ওরই মধ্যে কি স্বীকার করছেন না যে, সুবিধার জন্য সময়কে ভাগ করতে হয়? আমি শুধু এই সুবিধাকে সুবিধা ছাড়া অন্য কিছু নয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম মাত্র। মাপামাপির সময়, স্থান ও কাল, দুইই মাপকাঠি মাত্র। আদৎ কথা, মাপে পাত্রে, অর্থাৎ মানুষেই।

এর মানে নয় যে, কোনো মানসিক গঠন কোনো যুগেই ছিল না। এমন কোনো সভ্যযুগের কথা জানি না যখন মানুষ ছিল না। মানুষ থাকলেই মন থাকবে। আমি শুধু বলি, কালের মধ্যে এমন কোনো অন্তর্নিহিত দৈবশক্তি নেই যেটি নিজের জোরে, ব্যক্তিগত মনের গঠননির্ব্বিশেষে, নিজের ধর্ম্ম রচনা করতে পারে। কোনো ভৌগোলিক সীমানারও সে ক্ষমতা নেই, কোনো ঐতিহ্যেরও নেই। মনের সংস্পর্শে এসেই তাদের সার্থকতা ফুটে উঠে। সেগুলি মাল-মশলা, কিংবা terms of reference মাত্র। মনই স্বধর্ম্মের সূত্রপাত করে; আরো খুটিয়ে বলতে গেলে, মস্তিষ্কেই ঝোঁকের ঝাঁক্ বাসা বাঁধে। কার্য্যকরী শক্তিটা মনের। প্রতিবেশের, অতীতের, বর্ত্তমানের, ভবিষ্যতের আশা-ভরসা, এমন কি, region-এর প্রকৃতিদত্ত

গাছপালা, জন্তু-জানোয়ারের, folk, place, work, tradition-এর পরিপ্রেক্ষিতে সে-ধর্ম্ম দিশা পায়, রূপ নেয়। রূপ নিলেই এই সর্ব্বসাধারণের মানসিক ধারা ও অনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলা হয়। ধর্ম্মের যে ধারা কেটে চল্‌ল, সেটা অভ্যাস-ধারা; সে ধারা মরুতে হারায় না, জোর ফল্গুনদীর মতন বালির মধ্যে আত্মগোপন করে। যখন সেই বালি খুঁড়তে মানুষ নারাজ হয়, তখনই মানুষে বলে, ধারা লুপ্ত হয়েছে। এখন আমি যদি বালি খুঁড়ে, ধারা উদ্ধার করে, সে ধারার প্রবাহে স্নান করি, তখন জোর আপনি উপদেশ দিতে পারেন, কলের জলে স্নান করা আমার পক্ষে বেশি স্বাস্থ্যকর। এর বেশি আর কিছু বলা চলে কি? সে ধারা কখনই ছিল না কিংবা নেই—বলা গলাবাজি।

উপমার অন্তরালে, সেই নদীর মতনই, যদি যুক্তপ্রবাহ হারিয়ে থাকে তাহলে আপনার পন্থাই অনুসরণ করছি, সুবিধার জন্য। যুক্তিকে খণ্ড খণ্ড করে দেখাচ্ছি। যুগধর্ম্মে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে চাই না কেন?

(১) যুগধর্ম্ম বলে যদি বাইরের কোনো শক্তি থাকে, তাহলে সে শক্তি কোন্ শ্রেণীর লোকের কোন্ ব্যবহারের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয় বোঝা যায় না। অতিমানবের না জনসাধারণের? অনেক স্থলে যা ইঙ্গিত করেছেন তাই থেকে বোঝা যায় যে, আপনি অতিমানবের ভক্ত। কার্লাইল থেকে উদ্ধৃতাংশটুকুই তার যথেষ্ট প্রমাণ নয় কি? কিন্তু অ-সাধারণ ব্যক্তির কার্য্যাবলী যা লক্ষ্য করেছি তাইতে মনে হয় যে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এই আনুষ্ঠানিক আচার অর্থাৎ যুগধর্ম্মের বিপক্ষে লড়াই করেন, লড়াই করে

সেই পুরাতন অভ্যাসের জড়ত্ব, নিশ্চলতা, তদবস্থ-স্থিতি-প্রবণতাকে সজীব ও সচল করেন। সজীব ও সচল হয়েই আপনার 'যুগধর্ম্ম' নব-রূপে রূপবান হয়ে ওঠে। তারপর, এই নব-যুগধর্ম্ম জনসাধারণের দ্বারা অনুকৃত হয়, নবত্ব তার ঘুচে যায়। (অনুকরণ-প্রবৃত্তি বলে মানুষের একটা প্রবৃত্তি আছে বলছি না)। এখন কা'কে ধর্ম্ম বলব—অনুকরণকে না অনুকরণের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানকে ? সামাজিক ব্যবহার বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, বিরোধ ও সৃষ্টির কাজ অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গেই চলছে।

এই প্রসঙ্গে একটা ছোট কথা মনে হচ্ছে। কে এই যুগধর্ম্ম ব্যাখ্যা করছে ? ডাঃ সাফাৎ আহাম্মদ খাঁ মুসলমান শিক্ষিত সমাজের যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, না ঢাকার 'শিখা' সম্প্রদায় ও 'জয়তী'র দল ? রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, না নব্য-সাহিত্যিকবৃন্দ ? সাহিত্যের কথা ছাড়ুন—রাজনৈতিক আন্দোলনই কি যুগধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ ? শিশুমৃত্যুর হার কমান নব্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, না ক্যান্‌সার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ ? নোবেল সাহেবের, রক্‌ফেলার সাহেবের কোন্ দিকটা নব্য ? দু'দিকই বল্লে চলবে না, কেননা প্রত্যেক যুগের যে পরিষ্কার বৈশিষ্ট্য আপনি দেখিয়েছেন, তাই থেকে মনে হয় যে, নিজের মতকে প্রতিপন্ন করতে পণ্ডিতের মতনই অর্দ্ধেক ত্যাগ করতে আপনি সদাই প্রস্তুত। ইতিহাসে দেখেছি, যখনই যুগধর্ম্মের কথা উঠেছে তখনই তার পিছনে কোনো শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রয়াস রয়েছে, যখনই নবযুগ-প্রবর্ত্তনের কথা তোলা হয়েছে তখনও তাই। আপনার আমার মতন

বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য বোধ হয় শ্রেণীগত স্বার্থের বাইরে দাঁড়ান। মেয়েদের চুল ছেঁটে ফেলে নারী-সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে দেবার পিছনে প্যারিসীয়ান নর-সুন্দরদের আত্মরক্ষার গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল শুনেছি।

অতএব আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যুগধর্ম্মের বাহ্যিক অস্তিত্ব মানলে বড় ছোট, প্রকৃত অপ্রকৃত, ভালো মন্দ, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, সৃষ্টি অনাসৃষ্টি, কীর্ত্তি অকীর্ত্তির, অর্থাৎ মূল্যের ভেদাভেদ থাকে না। একে হিন্দু, সেজন্য একটা না একটা ভেদাভেদ মানতেই হয়, তায় শিক্ষিত, সেজন্য আরো কুণ্ঠিত হয়ে দিন গুজ্‌রান্‌ করতে হয়। ঠাট্টা ছেড়ে দিন,—যা হয় একটা কিছু-কে বড় নাম দিয়ে কিংবা যা করে হোক্‌, জোর করে চালাতে পারলেই হলো, তারপর আমরা বিদ্বানের দল আছি। একটা কোনো কিছু বাজারে প্রতিপত্তি লাভ করুক, তারপর আমরা সংখ্যার সাহায্যে তাকে যুগধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ বলে খাড়া করে দেবোই দেবো। মোটা মোটা কেতাবে তার প্রকৃত পরিচয় দেবো—আমাদের ছাত্রেরা পড়বে। সে যুগধর্ম্ম কত মাইল বেগে এক বৎসরে ছুটছে, ম্যয়্‌ তাও থাকবে। এই উপায়ের উপকারিতা যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তগুলো ভালো করে দেখলেই টের পাবেন, সেই average tendency বার করার মূলে আছে নির্ব্বাচন-শক্তি এবং সে শক্তি সব সময়ে সংস্কার মুক্ত নয়। যদি তাকে শুদ্ধ রাখার প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহলে আমাদেরকে সদাই সন্দিগ্ধচিত্ত হোতে উপদেশ দিন, যুগধর্ম্মের অস্তিত্বে গোড়া থেকেই আস্থাবান হোতে অনুরোধ করবেন না। অরবিন্দ ও রবীন্দ্রের প্রতি যে মনোভাব

আনতে বলেছেন, সেই মনোভাবের সাহায্যেই যুগধর্ম্মে বিশ্বাস রাখা যায় না। তাঁদের ওপর বর্ত্তমান কেন, পূর্ব্বতন সব যুগের প্রতিক্রিয়ার ছাপ আছে, কিন্তু তাঁরা কোনো যুগেরই দাস নন্।

(২) অসাধারণ ব্যক্তির ব্যবহারে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি। তাঁরা যে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কিংবা সমসাময়িক যুগের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন, এ কথা হয়ত কেউ বলে না। কিন্তু এ কথাও ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, তাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সংস্কারবাহী মনুষ্য-বলদ হওয়ার চেয়ে, সে সংস্কারে আত্মনিবেদন করে সহজে কাজ হাঁসিল করার চেয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এই যুগেরই অস্থায়ী সংস্কারকে কিংবা কোনো ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে চিরন্তন সত্যের কোঠায় তুলতে বেশি ব্যগ্র। লড়াই করাটাই চরম কথা নয়, শেষটাই ঢের বেশি দরকারী কাজ; নচেৎ আমিও ত' লড়াই করি! চির-চঞ্চলকে স্থায়ী করা, শাশ্বতে পরিণত করা 'অতিমানবের' একটি চিহ্ন। বাঁশবনের ভেতরে হাওয়া ঢুকে শন্ শন্ করছে, তাই শুনে আনন্দ পাচ্ছি, এও এক ধরণের মানুষের স্বভাব; আবার সেই বাঁশকে পাকিয়ে তাকে তপ্ত ছুঁচ দিয়ে ফুটো করে, বাঁশীতে পরিণত করে, সেই বাঁশীতে শ্রীমুখের ফুঁ দিয়ে বাজান এবং বাজিয়ে আনন্দ পাওয়া ও দেওয়া আর এক ধরণ মানুষের স্বভাব। যে বাঁশী তৈরি করে, কিংবা বাজায়, সে কি বাঁশকে অস্বীকার করে? সে শুধু বাঁশ বেছে নেয়, তাকে ফুটো করে বাঁশী বাজায়।

*

(৩) পূর্ব্বোক্ত দুই কাজ ছাড়া আপনার 'অতিমানব'ই কখনও কখনও আর এক উপায় অবলম্বন করেন— নিজের অখণ্ডতা অটুট রাখবার জন্য। সে উপায়কে পলায়ন বলা হয় কিন্তু তাকে নিষ্ক্রমণও বলতে পারেন। আপনি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশক্তির অনুপযুক্ততা এবং অরবিন্দের অন্তর্মুখীনতা নিয়ে যা কড়া মন্তব্য করেছেন তাই পড়ে মনে হয়, এই 'যুগধর্ম্মের' প্রতি বিমুখ হওয়ার জন্যই তাঁরা আপনার শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। বোধ হয় আপনার বিশ্বাস এই যে, তাঁরা যুগধর্ম্ম মানেন না, এবং সেইজন্যই পণ্ডিচেরী কিংবা য়ুরোপে পলায়ন করেন। এ বিশ্বাসটা ভুল, সম্পূর্ণ ভুল বল্‌লেও অত্যুক্তি হোত না। তাঁরা যুগধর্ম্মের হীনতা, অর্থাৎ ফ্যাসানের অংশটুকু পরিহার করতে ব্যগ্র, অথচ যুগধর্ম্মের ভালো অংশটুকু (কি সেটা আপনাকে বলে দিতে হবে না, আমার মতে —বিশ্বের কল্যাণ) তাঁরা পুরোপুরি গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সভ্যতার মানবিকতা, কল্যাণ-চিন্তা অরবিন্দের প্রত্যেক ছত্রে, প্রত্যেক কর্ম্মে পরিস্ফুট। তিনি বর্ত্তমান যুগের 'আধুনিকতম' সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শন-ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। আজকাল তিনি বড় বেশি লেখেন না, কিন্তু যখন লিখতেন, অর্থাৎ দশপনের বৎসর পূর্ব্বে, তখন বর্ত্তমান চিন্তাধারার দোষগুণ যা দেখিয়েছিলেন তা এখন বড় বড় বিদেশী মহারথীদের বড় বড় কেতাবে পড়ে মুগ্ধ হই। তাঁর একটা ছোট বই অনেক আগে পড়ি, evolution নিয়ে, তারপরে ঐ সংক্রান্ত ন্যূনকল্পে এক ডজন বই ঘেঁটেছি; সে বইয়ের বেশি অন্য কোথায়ও মূলকথার সন্ধান পেয়েছি

স্মরণ হয় না। পেয়েছি শুধু barren facts। আমার কথা ছেড়ে দিন্। সকলেই জানে যে, অরবিন্দ এই যুগের, যদি না জানত, তাহলে সনাতন হিন্দুরা তাঁর যোগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের মধ্যে পশ্চিমী সভ্যতার আমেজ পেয়ে তাঁকে অতটা অবহেলা করত না। অরবিন্দ এই যুগেরই লোক, তাঁর পণ্ডিচেরী-প্রয়াণ বর্ত্তমান যুগের সমস্যা হোতে পলায়ন নয়। বিজ্ঞানের সমালোচনা করার অভ্যাসটাও তাঁর আধুনিকত্বের পরিচায়ক। বিজ্ঞানের গোড়ায় যদি গলদ থাকে, বৈজ্ঞানিক উপায়ের মধ্যে যদি ফাঁকি থাকে, তাহলে সেই ফাঁকি দেখান মধ্যযুগীয় মনোভাব, না নব-যুগের বুদ্ধিবাদী সন্দিগ্ধচিত্ততার প্রকৃষ্ট পরিচয়? সেই ভুলকে পরিহার করে, অন্য উপায়ে—যেটি পুরাতন উপায়ের পুনরাবৃত্তি নয়—জীবন-যাত্রা চালান, জীবন-সমস্যার নিরাকরণ করাতে কী মধ্যযুগীয় কাপুরুষতা আপনি পেয়েছেন, আমি বুঝি না। কোন্‌টা যুগধর্ম্ম—বিজ্ঞানে অন্ধ-বিশ্বাস, না বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অপূর্ণতা দেখান? অন্ধ-বিশ্বাসই যদি আপনার মতে অন্ধকার-যুগের চিহ্ন হয়, তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, এই যুগে বিজলী-বাতি হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মনের অন্ধত্ব ঘোচেনি। বিজ্ঞানেরও একটা ক্ষণিক ফ্যাসান থাকতে পারে না কি? আবার দেখুন, গতানুগতিকতার মধ্যে ফাঁকি থেকেই যায়, বিজ্ঞানও ভীষণ রকম গোঁড়া হোতে পারে, অর্থাৎ ভুলকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে, ভালবাসে, চায়। শ্রুতি-স্মৃতির প্রামাণিকতা শুধু ধর্ম্মক্ষেত্রেই বাধা দেয় না, বিজ্ঞানেও দিয়ে থাকে,—বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যদি যুগ মানতেই হয় তাহলে বলা চলে যে ফাঁকি ধরাই

এই যুগের কাজ,—উপায় মার্জ্জিতবুদ্ধি, reason, শুধু scientific method নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি এই যুগেরই আবিষ্কার? ওটা প্রকৃতিকে জয় করবার বহু পুরাতন অস্ত্র। সে অস্ত্রের প্রয়োগও ছিল বহুল। আজকাল শাণ দিয়ে চক্‌চকে হয়েছে মাত্র। বরাবরই সর্ব্বক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ হোত। তবে সে পদ্ধতি ছিল তখনকার বিজ্ঞানের পদ্ধতি। এখন জ্ঞান বেড়েছে, বিজ্ঞান মার্জ্জিত হয়েছে, তাই প্রয়োগও হচ্ছে বহুলতর ক্ষেত্রে ও নির্ম্মমভাবে। সমগ্র অতীত যুগের মাজা-ঘষাতে এই অস্ত্র ধারাল হয়েছে। তাই স্বীকার করতে হয়, এ যুগে ওর চেয়ে ভালো যন্ত্র বেরোয়নি, তাই বলি যেখানে পারি ঐ যন্ত্র প্রয়োগ করব। আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে যদি এ কথা বলেন, তাহলে আমি বলা-কওয়া ছেড়ে দেবো, কেননা আমার বিশ্বাস, আমার কথাই আপনি আমার চেয়ে ঢের ভালো করে বলতে পারবেন। তবে স্বীকার করবেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ এই যুগের সৃষ্টিও নয়, প্রধান চিহ্নও নয়। যেখানে পারছেন না লাগাতে, তখনও স্বীকার করতে হবে। অবশ্য দু'দিন পরে লাগাতে পারব এই আশা বুকে পোষণ করতে হবে,—তবেই হব rational, নয় কি?

রবীন্দ্রনাথ বছরে বেশির ভাগ সময়ই বিদেশে থাকেন, কারণ অরবিন্দের মতন তিনিও 'যুগধর্ম্ম-প্রবাহে' আত্মোৎসর্গ করতে নারাজ। আপনি লিখেছেন যে, তিনিও বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের বিরোধী, কেননা 'তপোবনের আদর্শ'—বিজ্ঞানমুখী চিত্তের প্রাখর্য্য ম্লান ......ইত্যাদি। আপনি নিশ্চয় Golden Book of

Tagore-এ ডাঃ মেঘনাদ সাহার প্রবন্ধটি দেখেছেন। শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী জয়ন্তী-উৎসর্গে এবং Golden Book of Tagore-এও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পুস্তকাবলীর বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা কয়েও দেখেছি। বড় কবিদের মধ্যে অতগুলি বিজ্ঞানের উপর অত গভীর অনুরাগ এক গ্যেঠে ছাড়া আর কারুর কাছে পেয়েছি বলে ত' মনে হয় না। তাও ছেড়ে দিন। বিশেষ করে ইদানিংএর লেখায়, কি পদ্যে, কি গদ্যে, বৈজ্ঞানিক তথ্য নিজের চিন্তার মধ্যে এনে তিনি ভাষাকে কতটা সমৃদ্ধ করেছেন লক্ষ্য করেননি কি? বনবাণী, শেষের কবিতা, যাত্রী, পূরবী, প্রবাহিণী, আমার টেবিলে রয়েছে। পাতা উল্টে দেখলুম যে, প্রায় প্রত্যেক পাতায় অন্তত একটা না একটা বিজ্ঞান থেকে তুলনা দেওয়া হয়েছে। আপনি বলবেন, এগুলো তাঁর উপমার মাল-মশলা। স্বীকার করছি, কিন্তু এই উপমা থেকেই কি নির্ণয় হয় না তাঁর মন কোন্ দিকে খাদ্য খুঁজতে ঝুঁকেছে? তাঁর content কি তাঁর form-কে নতুন ভাবে গড়ে তুলছে না? কবির কাছে কি চান? যা তিনি নন্, অর্থাৎ পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিক, তাই নন্ বলে দুঃখ করে লাভ কি? আপনি নিজেই লিখেছেন, গ্যেঠের মতন তিনি বৈজ্ঞানিক হোন্ এ আশা করেন না।

এইখানে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। একজন কবি কিংবা সাহিত্যিক বিজ্ঞানের কতটুকু অংশ গ্রহণ করতে পারেন বিবেচনা করেন? প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় বসে থাকার চেয়ে নিজের মনের কথা লিখে

যোগধর্ম্মের যুক্তি

সকলেই স্বীকার করেন যে আশ্রম সমাজের বীজক্ষেত্র। সকলের কিন্তু মনে থাকে না যে আশ্রম সমাজের শক্তিকেন্দ্র এবং সংস্কার-গৃহ হওয়াও উচিত। নানা কারণে মানুষের শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়। শক্তির ক্ষতিপূরণার্থ প্রত্যেক মানুষকে কিছুকালের জন্য অবসর নিতে হয়, দৈনন্দিন কর্ম্ম থেকে নিরস্ত হতে হয়। কিন্তু চিরকালের জন্য অবসর গ্রহণ করাও যা, আর সামাজিক মৃত্যুও তা। বলা যেতে পারে যে, সামাজিক মৃত্যু সত্যকারের ধর্ম্মের পক্ষে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মোক্ষের পক্ষে, নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু যাঁরা এই তর্ক তোলেন, যদি তাঁদের আচার-ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় অন্য ধরণের, কিন্তু মূলত সেই মামুলী সমাজ-প্রতিষ্ঠানের, চেষ্টা থাকে, তাহলে সেই আচার-ব্যবহারের সামাজিক ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত নয়; যদি দেখি তাঁদের ব্যবহারে বৈরাগ্যের পার্থিব হেতু ও সমাজের প্রতি ঘৃণার সামাজিক কারণগুলি বিষাক্ত জীবাণুর মতন গোপনে প্রবেশ কোরেছে তাহলে তাঁদের অসঙ্গতি দেখাবার অধিকার আমাদের আছে; যদি সন্ন্যাসীদের সামাজিক মৃত্যু কোন নবজীবনের প্রবেশপত্র প্রমাণিত না হয়ে থাকে, তাহলে আশ্রমকে সন্দেহের চক্ষে দেখলে পাপ হবে না নিশ্চয়। যাঁরা সংসারের প্রতি বিরক্ত হয়ে বনবাসী হলেন, তাঁদের কথা একেবারে ভিন্ন হলেও খানিকটা বোঝা যায়—অর্থাৎ তাঁদের নিকট আমরা কিছুই প্রত্যাশা করি না। এই ধরণের সন্ন্যাসী নিজের জপতপ, নিজের মুক্তি নিয়েই ব্যস্ত—কোন আশ্রম স্থাপনই করেন না—যেমন পওহারী বাবা ও ত্রৈলঙ্গস্বামী।

সকলে মিলে যোগ কোরব, জপতপ কোরব, আশ্রমের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য চেষ্টা কোরব, ভিন্ন আশ্রমের প্রতি কটাক্ষপাত কোরব, সমালোচনায় বিচলিত হব—অর্থাৎ পুরাতন পরিত্যক্ত সমাজের নিতান্ত সাধারণ মনোভাবগুলি লুপ্ত হবে না—তাহলে সমাজ পরিত্যাগ কোরে বেশি কি লাভ হলো! যে লাভটুকু হলো সেটি পয়সা দিয়ে কেনা যায়। পওহারী বাবা, ত্রৈলঙ্গস্বামীর ব্যবহার আলোচনা করবার ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু সাধারণ আশ্রমবাসীদের ব্যবহার সকলেরই আলোচ্য হোতে পারে।

এ-ত গেল আশ্রমবাসের বিপদ, যেটি পরে চোখে পড়ে। আদিতে যে প্রবৃত্তি থাকে তার সামাজিক ব্যাখ্যা অনেকে করেছেন। তাঁদের মতে, সমাজের বিপক্ষে যখন আর মানুষ যুদ্ধ চালাতে পারে না, তখন আত্মরক্ষার জন্য মানুষ আশ্রমে প্রবেশ করে। আশ্রমবাসের পিছনে একটা না একটা নৈরাশ্য থাকা চাই। পরে অবশ্য সেই নৈরাশ্যকে একটা গালভরা নাম দিয়ে মনকে ঠকান হয়। সমাজকে মনের মতন কোরে গঠন করবার শক্তি না থাকার জন্য নতুন আদর্শ-সমাজ গড়ে তোলবার প্রবৃত্তি আসে। সামাজিক ব্যাখ্যা ছেড়ে দিয়ে, এই প্রবন্ধে আমি একটি তথাকথিত শুদ্ধ ধর্ম্মভাবের আলোচনা কোরব। ন্যায়ত, এই শুদ্ধভাবের কোন নাম দেওয়া যায় না। যে প্রেরণা অনুভূতিসাপেক্ষ তার কি নাম হোতে পারে? যে ভাব সাধারণের গোচরাতীত তাকে ভাষার গণ্ডীতে আবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। তাকে গোড়া থেকেই অব্যক্ত বলা ভাল। ইংরাজী শিক্ষিতেরা এই প্রেরণামূলক দর্শনকে মিষ্টিসিজ্‌ম্ বলেন। একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক* আমাকে বোলেছেন যে,

মিষ্টিসিজ্‌মের কোন যথার্থ সংস্কৃত প্রতিশব্দ না থাকার কারণ এই যে, উক্ত দর্শন হিন্দুশাস্ত্র-না-জানা ইংরাজী শিক্ষিতের দ্বারাই আবিষ্কৃত। আর একজন পণ্ডিত একে যোগধর্ম্ম কিংবা যোগজ প্রত্যক্ষবাদ বোল্লেই চলবে বোলেছেন। সেইজন্য প্রবন্ধের নাম 'যোগধর্ম্মের যুক্তি' দিয়েছি। যোগ যুক্তির অতিরিক্ত হোতে পারে, কিন্তু যোগধর্ম্ম অযৌক্তিক হলে লোকে গ্রহণ করবে কেন? ধর্ম্মের তত্ত্ব যেকালে গুহায় নিহিত, তখন মিষ্টিসিজ্‌ম্‌কে গুহ্য-ধর্ম্ম এবং যোগধর্ম্মের প্রেরণাকে গুহ্য-বৃত্তি বলা যেতেও পারে।

এখন দেখা যাক্ মিষ্টিক্ কি বলেন।

ভিন্ন দেশের ভিন্ন মিষ্টিক্‌দের ভাষা ভিন্ন হলেও তাঁদের মূল বক্তব্যে বোধ হয় বেশি পার্থক্য নেই। বলা বাহুল্য যে মিষ্টিসিজ্‌ম্ বোলতে ভৌতিক শক্তিতে বিশ্বাস, কিংবা মরমী কবির রচনা-পদ্ধতি, কিংবা মানব-মনের স্বাভাবিক গহনা-গতি নির্দ্দেশ করছি না। তবে এ কথা ঠিক যে, গুহ্য-ধর্ম্মে কিংবা যোগধর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত মনোবৃত্তি প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। এই কয়টি বোধ হয় মিষ্টিক্‌দের মোট কথা।

(১) এই ব্যবহারিক, সাধারণ ইন্দ্রিয়গম্য, পরিমেয় জগৎ, এবং অনুমান, উপমান ও শব্দসিদ্ধ নিশ্চয়ের হেতু ভিন্ন অন্য একটি প্রত্যক্ষ, প্রমাণসাপেক্ষ জগৎ ও নিশ্চয়ের হেতু আছে;

(২) সেই জগতই একমাত্র সত্য এবং সেই প্রমাণই সুনিশ্চিত; অন্য জগত অ-সত্য, অন্য প্রমাণ অবান্তর;

(৩) সেই জগতের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য, অর্থাৎ সত্য উপলব্ধির জন্য, একটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিতে হবে। ইন্দ্রিয়টির একটি নাম বোধি।

আমি পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের পর পর আলোচনা করছি।

(১) এমন কেউ মূর্খ নেই যে পরিমাণের সংখ্যাকে, pointer-readings-কে, মাপকাঠিকে, প্রমেয় বস্তু মনে করে। চাঁদের আলোকে candle-power-এ মাপা এক তাঁদের দ্বারাই সম্ভব যাঁরা ঘরের বাতিকে চাঁদ মনে করেন। গোটাকয়েক জিনিষ আছে যার মাপ সংখ্যার দ্বারা অসম্ভব, যেমন সৌন্দর্য্যজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান। এই জ্ঞান কিংবা অনুভূতিকে নিয়ে সংখ্যামূলক বিজ্ঞান তৈরি করা বোধ হয় যায় না। কিন্তু এই কথা বোল্লেই শেষ কথা বলা হলো না। কোন একটি গান শুনে আমাদের বড় ভাল লাগল। কতখানি ভাল লাগল মাপবার উপায় নেই ; কিন্তু এ কথা ঠিক যে, যদি গায়কের স্বরগুলি শ্রুতি থেকে ভেসে ভেসে বেড়াত তাহলে ভাল লাগত না। শ্রুতি শুধু সংখ্যা নয় জানি, শ্রুতির সংখ্যা হয়ত মিষ্ট গলা থেকেই নেওয়া, কিংবা তারের শব্দ থেকে নেওয়া। যে গলা কিংবা তারের আওয়াজ থেকে শ্রুতি নেওয়া হয়েছিল সে আওয়াজ যখন শুন্‌তে পাচ্ছি না, আপাতত নতুন গলার আওয়াজ শুনেই ভাল লাগছে, তখন এই আনন্দ-উপভোগের একটি স্থির সমর্থন রয়েছে। এ সমর্থন প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা সুনিশ্চিত। কেননা শ্রুতির সমর্থনে ব্যক্তিগত ভুলের সম্ভাবনা কম। সুরের মতো, জীবনকেও মাপা যায় না, কিন্তু যাঁরা এ কথা ভাল রকমই জানেন তাঁরাও জীবন শেষ হবার সম্ভাবনা আছে সন্দেহ কোরলেই ডাক্তার ডেকে হৃদয়ের স্পন্দন ও নাড়ীর গতি মাপতে ব্যগ্র হন্‌।

আমি বলি, যতদূর পারি সব অভিজ্ঞতাকে কঠোর ভাবে পরীক্ষা কোরব। পরীক্ষা সংখ্যাস্থিত হলে সব চেয়ে ভাল হয়, কিন্তু না হলেও চলে। সংখ্যামূলক পরীক্ষার দ্বারা যাচিয়ে নেবার প্রয়াসে অনেক লাভ হয়—ক্ষতি যা হয় পূর্ব্বে উল্লেখ কোরেছি, সৌন্দর্য্যজ্ঞান কিংবা ধর্ম্মজ্ঞানের আসল প্রকৃতি ধরা পড়ে না। লাভের কথা এখন লিখছি। গোড়াতেই বাজে জিনিষ বাদ পড়ে, যেমন intelligence-test-এ হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীর কেবল ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতা ধরা পড়লেও, প্রতিভা আবিষ্কৃত না হলেও, যারা বোকা ও হাঁদা তারা প্রথমেই বাতিল যায়, এবং তাদের মধ্যে প্রতিভা আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই কম। দ্বিতীয়ত, পরিমাণের চেষ্টাতে পরীক্ষকের বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, কেননা অঙ্কের শাসন অত্যন্ত কঠোর। তৃতীয়ত,—এইটাই সব চেয়ে দরকারী কথা—অঙ্কের অগ্নি-পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হলে তবে বোঝা যায় কোন্ অভিজ্ঞতা অঙ্কের অতিরিক্ত।

সংখ্যাস্থিত পরীক্ষা না হলেও পরীক্ষা সম্ভব। অঙ্ক-শাস্ত্রের ইতিহাসে অনেক কঙ্কাল দেখা যায়। ইয়ুক্লিডের জ্যামিতি শুধু এক প্রকার ক্ষেত্রের জ্যামিতি দাঁড়িয়েছে। পরিমাণ করা প্রধানত চোখের কাজ। এমন কিছু ধরাবাঁধা নিয়ম নেই যে, বিজ্ঞান শুধু চক্ষুলব্ধ অভিজ্ঞতাতেই আবদ্ধ থাকবে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাও বিজ্ঞানের বিষয় হোতে পারে। শুধু তাই নয়, এমন বিজ্ঞানও বিজ্ঞান বোলে পরিগণিত হোতে পারে যেটি সংখ্যার উপর সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত নয়, যেমন রসায়ন-বিজ্ঞান ও জীবতত্ত্ব। এ দুটি বিজ্ঞানের কতটুকু অংশ

অঙ্কশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে? বিজ্ঞান যে কেবল পরিমাণ কোরতেই ব্যস্ত সব বৈজ্ঞানিক তা বলেন না। আমি মাত্র দুই জনের নামোল্লেখ করছি—একজন ফ্রান্সিস্ বেকন, অন্যজন আইনষ্টাইন। শেষোক্ত ব্যক্তিটি বোলছেন—'The object of *all science,* whether natural science or *psychology,* is to *co-ordinate* our experiences, and to bring them into a *logical* system.' *Italicised* কথাগুলির ওপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সত্য কথা এই যে, mathematical physicist-ই পৃথিবীর একমাত্র বৈজ্ঞানিক নন্। কিন্তু তাই বোলে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানকে অগ্রাহ্য কোরলে চলবে না। তাকে বরণ কোরে নিতে হবে। দান এই—একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা কল্পনা করা যায়, এবং সেই অভিজ্ঞতার জগতে আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতামূলক অঙ্কশাস্ত্রের সঙ্কেতকে খাটান ও বিস্তার করান যেতে পারে।

(২) মিষ্টিক্‌দের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, গুহ্য জগৎই সত্য এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণই নিশ্চিত। প্রথমেই দেখা যাক, কাল্পনিক অভিজ্ঞতার দ্বারা সৃষ্ট-জগতের প্রতি বৈজ্ঞানিকের কি মনোভাব। "...but it must not be regarded as telling us anything more than is warranted by our original sense-data. If it suggests more, it has been introduced somewhere in the logical development, in the language of the analysis, or in the initial abstractions on which the analysis is based. The suggestion may be fruitful, as

every imaginative effort may be, but it has to be tested on its merits before it can become a fact of science."—এই উক্তিটি আইনষ্টাইনের মতামত সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল লেখকের। এই উক্তিটি বিজ্ঞান সম্বন্ধেও খাটে, আবার যোগধর্ম্ম সম্বন্ধেও খাটে।

গুহ্য জগতের অস্তিত্ব মানলেও, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন মানলেও, সেই জগৎ এবং সেই জ্ঞান একমাত্র সত্য ও সুনিশ্চিত, অন্য জগৎ ও প্রমাণ অবাস্তর কি কোরে প্রমাণিত হয়? ন্যায়ের রীতিতে প্রমাণিত হয় না বটে, কিন্তু কি কোরে মানুষের মনে প্রমাণিত হোতে পারে তার আভাস দেওয়া যেতে পারে। আদিম সমাজে ইন্দ্রজালের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। ভয় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ভোজবিদ্যার প্রয়োজন ছিল। ঐন্দ্রজালিকের অতিপ্রাকৃত বিদ্যা তাকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় কোরে তোলে। মিষ্টিক্-দার্শনিক সেই ঐন্দ্রজালিকের বংশধর। মধ্যযুগের পুরোহিতসম্প্রদায় যা কোরে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য স্বর্গরাজ্যের মহিমা প্রচার কোরতেন, স্বর্গরাজ্যকে একমাত্র রাজ্য এবং এই জগৎকে হেয় প্রচার কোরতেন, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও স্বার্থসন্ধানের ধারা হয়ত মিষ্টিক-দার্শনিকের মনে অলক্ষিতভাবে এখনও বয়ে চলেছে। দ্বিতীয় আভাসের ইঙ্গিত করছি। প্রত্যেক জ্ঞানার্জ্জনের এক একটি ইতিহাস আছে। সব জ্ঞান-সঞ্চয়ের প্রথম এক অবস্থায় আহৃত তথ্য নিষ্কর্ষণ কোরে মনঃকল্পিত বাচ্য স্থির কোরতে হয়। বাচ্যগুলি অবশ্য নিরালম্ব। সেগুলি যেন সিঁড়ির এক একটি ধাপ—

না হলে ওঠাও যায় না, আবার চিরকাল ধাপে রোসে থাকলে জ্ঞানও বাড়ে না। কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞানে, সমস্ত জ্ঞানের ইতিহাসেই বোধ হয় দেখা যায় যে, মানুষ আরামের জন্য বাচ্যকে সত্তা বোলে ভুল কোরছে—বাচ্যকে ছাড়তে মন আর চাইছে না। মনে এমন একটি গাঁট পড়েছে যে ছাড়ান দুষ্কর। তুলনা বদলে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক বাচ্যটি যেন উপদেবতা হয়ে ওঠে। প্রত্যেক উপদেবতার একটি পুরোহিত জোটে—এই পুরোহিত জ্ঞান-বুদ্ধির প্রধান শত্রু। এতদিন পদার্থবিজ্ঞানে Substance, Force, সৌন্দর্য্যতত্ত্বে Beauty, অর্থশাস্ত্রে Utility, নীতিশাস্ত্রে Good প্রভৃতি অনেক গাঁট ছিল—অনেক উপদেবতা ছিল। এখনও নব্য মনোবিজ্ঞানে Libido, সমাজতত্ত্বে Group-mind, জীবতত্ত্বে Entelechy, Mneme জুটছে। দর্শনেও ঐ প্রকার বাচ্য, গাঁট, উপদেবতা আছে। সব চেয়ে অপকারী দেবতার নাম ঐশী-শক্তি, যার প্রধান পুরোহিত মিষ্টিক্। ঐশী-শক্তির দাপটে আমাদের সব শক্তি পঙ্গু হয়েছে। বুদ্ধির দিক থেকে, অভিব্যক্তির দিক থেকে, আত্মজ্ঞানের ক্রমবিকাশের দিক থেকে ঐশী-শক্তিকে যখন একটি ধাপ অর্থাৎ সুবিধামূলক বাচ্য বলে সন্দেহ করি, তখন বাচ্যকে সত্তা ভাবা পুরোহিতের নিতান্ত স্বাভাবিক কর্ম্ম বলে মনে হয়। সকলেই জানেন যে, প্রত্যেক পুরোহিত তাঁর ব্যবহৃত মন্ত্রকে স্বর্গরাজ্যের একমাত্র চাবি মনে করেন। চাবি যখন একটি, তখন সে চাবি দিয়ে যে জগতের দ্বার খোলা যায়, সেইটিই একমাত্র স্বর্গ প্রমাণিত হোতে বিলম্ব হয় না।

ব্যাপারখানি বিশদ কোরে লিখছি। আমরা প্রত্যেকেই কখনও স্বার্থপর, কখনও পরার্থপর—কখনও বা আমাদের আপন-পর জ্ঞানই থাকে না। একই ব্যবহারে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা মেশান থাকতে পারে। আডাম স্মিথ্ এই ব্যবহারগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত কোরতে চেষ্টা করলেন—তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি একটি সাধারণ গুণনীয়ক বেছে নিলেন। যাঁর যেমন উদ্দেশ্য, সিদ্ধি তাঁর সেই রকমের। অমনি একজন economic being, বৈষয়িকজীব, তৈরি হলো, প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক ব্যবহারে এই মন-গড়া মানুষটি পিছন থেকে অলক্ষ্যে কাজ করে প্রমাণিত হলো। সব মানুষই বৈষয়িক, ইকনমিক্ জগৎই একমাত্র জগৎ, মানুষের অন্যান্য ব্যবহার স্বার্থপ্রবৃত্তির বিকাশ মাত্র এক নিঃশ্বাসে প্রমাণিত হয়ে গেল। মনের কোথায় ফাঁকি হলো দেখাচ্ছি। একটি সাধারণ গুণনীয়ক মানুষের আকার নিয়েছে; একটি বর্ত্তমান উদ্দেশ্য-নির্দ্দিষ্ট সাধারণ গুণ পিছনে গিয়ে এত শক্তিশালী হয়েছে যে সেটি সত্তার, সমগ্রতার ওপর কড়া প্রভুত্ব কোরছে—তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়ে দিচ্ছে। ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত কার্য্যের একটি মাত্র কারণের শুধু নামটি, শক্তিমান হয়ে, গুহ্য উপায়ে, এমন কাজ আরম্ভ কোরে দিল যে, আর সত্তার একত্ব, নিজত্ব, বৈশিষ্ট্য রইল না। কি কোরে আডাম স্মিথ্ এই যাদুমন্ত্র শিখলেন তা সেই ভগবানই জানেন যিনি মিষ্টিকের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং মিষ্টিকের সেবাতেই পরিপুষ্ট। ফ্রয়েডও ঐ উপায়ে কামশাস্ত্র লিখেছেন। ফ্রয়েডের কাম-প্রবৃত্তি, মিষ্টিকের ঐশী-শক্তি, সমাজতত্ত্ববিদের হট্টমন, মনের এক ধরণেরই জুয়াচুরি।

মোদ্দা কথা এই যে hypothesis কিংবা fiction-কে সত্য বোলে ভুল কোরতে আমরা সকলেই প্রস্তুত, কেননা তাই মনে কোরলে মনের টান্-টান্ ভাবটি কেটে যায়—মনের ছিলে আল্‌গা হয়ে যায়, আমরাও স্বপ্ন দেখে বাঁচি। ফাঁকি দিতে আমরা সকলেই ব্যগ্র, কেননা, ফাঁকিতে আরাম পাওয়া যায়। তার ওপর যদি বিহার জোটে, তাহলে সোনায় সোহাগা! এক সঙ্গে ফাঁকি দিতে পারলেই সঙ্ঘারাম!

(৩) হয়ত আমি আডাম স্মিথ্, ফ্রয়েডকে যা বুঝেছি, মিষ্টিক্‌কেও তাই বুঝেছি। বুঝতে যে পারিনি তার কারণ কি? গুহ্য-ধর্ম্ম বুঝি না, তার কারণ মিষ্টিক্ বোলচেন যে, আমার বোধি বোলে কোন নতুন ইন্দ্রিয়ের স্ফুরণ হয়নি। আডাম স্মিথ্ বুঝতেও কি economic sense, ফ্রয়েড্ বুঝতেও কি sex-sense চাই না? কিন্তু সকলের গলদ ত' একই। বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সত্তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করা হয়েছে, সেই টুক্‌রো থেকে একটি বাচ্য তৈরি কোরে সত্তার স্কন্ধে চাপান হয়েছে। গলদ যখন এক, তখন গলদ বার করবার জন্য ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নেই—সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাই কাজ চলে—জোর না হয় সে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত কোরলেই চলে। গলদ বার করা ছাড়া অবশ্য বোঝবার অন্য দিক আছে। তা থাকলেও বিপদ এই যে, অভিজ্ঞতার যতগুলি শ্রেণী ততগুলি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। একটি ছোট ছেলের সাধারণত পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, সে আবার যদি হিন্দু হয়, তাহলে শাস্ত্রানুসারে তার আরো গোটাকয়েক ইন্দ্রিয় থাকতে বাধ্য, না হলে হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মাত্মক

সমাজের জাতি-বিচার, অবতার-বাদ, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতি লক্ষণগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন কোরতে পারবে না—আর তাই যদি না পারে তাহলে ছেলেটি যবনের বংশে জন্মগ্রহণ কোরেছে প্রমাণিত হলো, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সনাতন-ধর্ম্ম বিদ্যালয়ে চাকরী পাবার আশা রইল না—এক কথায় সে উৎসন্ন গেল। ছেলেটির বাবা যদি আবার তাকে কোন ভাল বিদ্যালয়ে পাঠান তাহলে চোদ্দ বৎসরেই তাকে আট দশটি বিষয় আয়ত্ত কোরতে হবে। অতএব প্রত্যেক হিন্দু বালকের কম কোরে কুড়ি পঁচিশটি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় থাকা চাই—নচেৎ সে হিন্দুও হবে না, মানুষও হবে না। যোগী হোতে গেলে আরো একটি চাই। বাস্তবিক পক্ষে কি আমাদের অতগুলি ইন্দ্রিয় আছে? সেইজন্য বলি যে, যতগুলি অভিজ্ঞতা আছে ততগুলি ইন্দ্রিয় না মেনে, এই সাধারণ বুদ্ধিকে মার্জ্জিত কোরলে কি ক্ষতি হয়? সাধারণ বুদ্ধিলব্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে শুদ্ধ কোরলে, বুদ্ধিকে মার্জ্জিত কোরলে সত্তাকে বোঝবার জন্য তাকে খণ্ড খণ্ড করবার দরকারও থাকে না। মনোবিজ্ঞানেও ত' gestalt এসেছে, জীবতত্ত্বে science of organisation এসেছে, পদার্থ-বিজ্ঞানেও entropy প্রবেশ কোরছে। অবশ্য এগুলিও পরে বাচ্য হবে—প্রত্যেকটি উপদেবতার আবার পুরোহিত জুটবে, প্রত্যেক পুরোহিত আবার জ্ঞানবৃদ্ধিতে বাধা দেবে। কিন্তু বিজ্ঞানে পৌরহিত্য কিংবা ভূতের উপদ্রব ক্ষণস্থায়ী।

আমার কথা এই, কেন আমি সহজে, প্রথমেই, না মাথা ঘামিয়ে, কোন অ-সাধারণ, অতিপ্রাকৃত, গুপ্ত, রহস্যময়

যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ কোরব ? ইংরাজী শিক্ষিত মিষ্টিক্ অবশ্য মাথা ঘামানোকে খারাপ কাজ বলেন না—অন্য মিষ্টিক্ বলেন কিন্তু। "বিশ্বাসে মিলিবে ইত্যাদি, তর্কে বহুদূর।" কিন্তু প্রায় সব মিষ্টিক্ই বলেন যে, সর্ব্ব-সাধারণেরই মধ্যে এমন একটি ইন্দ্রিয় আছে যেটি খুললেই জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন থাকবে না। অতএব প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হচ্ছে জ্ঞানালোচনা করার চেয়ে একটি গুপ্তমন্ত্রের সাহায্যে তৃতীয় লোচন খোলার প্রয়াস করা। যদি এই নতুন ইন্দ্রিয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তাহলে প্রত্যেক মানুষের সংস্কার, শিক্ষা দীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী এই ইন্দ্রিয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ কোরবে। বৈশিষ্ট্যের যা বিপদ তাই আবার ফিরে এল। যদি এই গুহ্য ইন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপারে সাধারণত্বের ছাপ থাকে তাহলে সে ছাপ গুহ্য ইন্দ্রিয়ের বশে যে অভিজ্ঞতা জন্মায় তার সহজ-গ্রহণীয়তাতেই আছে। অর্থাৎ, বোধির বৈশিষ্ট্য মানলে গুহ্য-ধর্ম্মের অভিজ্ঞতাকে সহজ ও সরল মনে হয়। তাকে বোঝবার জন্য নতুন কোরে খাটতে হয় না, তাকে গ্রহণ করবার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন বিচার-বুদ্ধি অনুমোদিত প্রমাণের অপেক্ষা কোরতে হয় না। অপেক্ষা না কোরলেই সব সহজ মনে হয়। সবই যেন স্বতঃপ্রণোদিত এবং স্বতঃপ্রমাণিত ঠেকে। গুপ্তমন্ত্র কি গুহ্যপদ্ধতি গ্রহণ করলে ত' আর কথাই নেই, সব জল হয়ে যায়! আমি ধর্ম্ম কেন, কোন অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেই এই ধরণের 'সস্তায় কিস্তি' সারা পছন্দ করি না।

যোগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান শুনেছি একেবারেই অনুভূতি-সাপেক্ষ। আমি অনুভূতিকে অতি সন্দেহের চোখে

দেখি। এক কারণ এই যে, সকল স্ত্রীলোকেরই অনুভূতি আছে। অথচ সকল স্ত্রীলোকের বুদ্ধি থাকে না। তাঁদের নির্ব্বুদ্ধিতার কারণ যদি শিক্ষা দীক্ষার অভাব হয়, তাহলে তাঁদের না শিক্ষা দিয়ে আমরা ভালই কোরেছি বোলতে হবে—কেননা তাঁদের যখন সহজ অনুভূতি আছে তখন আর কিছুর দরকার নেই—শিক্ষার ফলে বরঞ্চ অনুভূতির এনামেল উঠে যেতে পারে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে আবার যাঁরা বুদ্ধিমতী তাঁরা অনেকেই ব্যক্তির অসম্পৃক্ত কোন কাজে বুদ্ধিকে নিয়োজিত কোরতে পারেন না। তাঁদের অনুভূতি যদি থাকে, তাহলেও সে অনুভূতি কোন ব্যক্তিগত গুণসম্পর্কীয়। কিন্তু যোগের অনুভূতি যদি এই ধরণের হয়, তাহলে একটি মানুষ কিংবা মানুষের মতন দেবতাকে গুরু কোরতে হয়। গুরুবাদ কিন্তু ধাতে সয় না, এই বিপদ। এই বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, যদি আমাদের একটি সত্য কথা বলবার সাহস থাকে, যথা—স্ত্রীলোকদের বাস্তবিক কোন অনুভূতি নেই। যদি থাকত, তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারতেন যে, তাঁদের অনুভূতিটি আমাদের দেওয়া সাড়ী, গহনা, গ্রামোফোনের মতনই উপহার মাত্র। তাঁদেরকে নিয়ে ঘর কোরতে হয়, তাঁদের দিয়ে কাজ করাতে হয়—নিতান্ত নিরীহ ও শান্তিময় উপায়ে ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা বুদ্ধিমতীদের আছে। তাই তাঁদের মনস্তুষ্টির জন্য, সংসার শান্তিময় করবার জন্য, তাঁদেরকে আমরা খোসামোদ করি। সেইজন্য তাঁদের একটি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় দিয়েছি এবং তাঁদের বুঝিয়েছি—নানা উপায়ে—বিশেষত কবিতা লিখে—যে, এই

অনুভূতির মতন জিনিষ আর নেই—এটি বুদ্ধির চেয়ে ঢের সূক্ষ্ম, ঢের কার্য্যকরী, বেশি সুনিশ্চিত—অতএব বুদ্ধি যদি কম থাকে, কিংবা না-ই থাকে, তাহলেও তাঁরা আমাদের প্রিয় বস্তু। সহজানুভূতি উপহার পাওয়ার অন্য উপায়ও আছে। এই ধরণের অনুভূতির সঙ্গে সত্য অনুভূতি যদি থাকেও তবে তার পার্থক্য কোথায়, ধরা শক্ত। তর্ক উঠতে পারে যে, মেয়েদের অনুভূতি নেই বোলে মিষ্টিকের অনুভূতি নেই প্রমাণ হয় না। উত্তর এই—সমস্যা মিষ্টিকের কি আছে কি নেই, তা নয়। সমস্যা এই, প্রশ্ন এই যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি গুপ্ত ইন্দ্রিয় আছে কি নেই। মিষ্টিক্ বলেন, আছে —আমার সন্দেহ, নেই। শুধু তাই নয়; আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, সাধারণ স্ত্রীলোকদের যেমন কোন অনুভূতি নেই, সেটি আমাদের উপহার মাত্র, এবং যদি থাকে তার প্রভাবে ও তাড়নায় বিপথগামী হোতে হয়, তেমনি প্রত্যক্ষজ্ঞানীর তথা-কথিত সহজানুভূতি আমাদের মন-ভোলান উপহার হোতে পারে। সেই উপহার-সামগ্রীকে যাচাই কোরে নেওয়া পুরুষোচিত ব্যবহার। (সহজানুভূতি-বিশ্বাসী পুরুষ মেয়েদের তরফদারি কোরতে গিয়ে, আশা করি, নিজের পুরুষালী দাম্ভিকতা এবং মনের মেয়েলী গঠন দেখাবেন না)।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের তাড়নায় হাজার হাজার ভুলের মধ্যে হয়ত একটি সত্য বোঝা গেল। সে সত্যের মূল্যও আমাদের গ্রহণ ও ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। আমি Paul Valery-র Introduction to the Method of Leonardo Vinci থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি। "Our

revelations are only happenings of a certain kind and it is *still* necessary to interpret events which occur in the domain of knowledge . . . It is always necessary." "Even the happiest of our intuitions are results that are *inexact; through excess as compared with our normal understanding, through deficiency when considered in relation to the infinity* of lesser things and particular cases which they seem to bring within our grasp. Our personal merit, which is what we strive after, consists less in submitting to them than in seizing them, and in seizing them less than in sifting them." আর্টেও অনুভূতি সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। "The intuitive element, then, is far from giving their quality to works of art. Take away the artist's work and your intuition is *no more than a spiritual accident, lost among the statistics of the local life of the brain.* Its true value does not rise from the *mystery of its origin,* nor form the *supposed depths* out of which we *like to think* it has emerged, nor even from the *delighted surprise* it comes in ourselves; but because it meets our *wants* and, in short, because of the *considered use* to which we can put it, because, that is to say, of its *utility* to the whole personality."

Italicised অংশগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সহজানুভূতি সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তব্য আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হলো, তাই আমার নিজের কথাগুলি একত্রে সাজিয়ে প্রবন্ধ শেষ করছি।

আমি সাধারণ বিচারবুদ্ধির শক্যতা ও সম্ভাব্য শক্তিতে বিশ্বাস করি। সেইজন্য অসাধারণ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব মানতে সহজে রাজি নই। তথাকথিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই বিচার-বুদ্ধির মার্জ্জিত-সংস্করণ। বুদ্ধি যখন মার্জ্জিত হলো, তখনই সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি হয়। বুদ্ধি যখন পরিমার্জ্জিত হলো তখনকার অভিজ্ঞতাই সহজ, সরল, প্রত্যক্ষ মনে হয়। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের পূর্ব্বাবস্থা, ধারা, রীতি, নীতি মোটেই সোজা নয়, ন্যায়ের দ্বারা আবদ্ধ। মার্জ্জিতবুদ্ধিলব্ধ অভিজ্ঞতার মূল্য খুব বেশি, তবে অন্য ধরণের অভিজ্ঞতার অনাপেক্ষিক মূল্য অপেক্ষা বেশি কি কম জানি না। অন্যান্য অভিজ্ঞতার জন্য যে ধরণের সতর্কতার প্রয়োজন, এই অভিজ্ঞতার জন্য সেইরূপ সতর্কতা অবলম্বন কোরতে হবে। এতদিন প্রাকৃতিক জগৎ নিয়ে কত না আলোচনা হলো। কালকার মত আজ বাতিল হলো। পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও জীবতত্ত্বের সম্পাদ্যগুলি পরিত্যক্ত হলো, কিংবা রূপান্তরিত হলো, কিন্তু এই গুহ্যজগৎ ও গুপ্তইন্দ্রিয় সম্বন্ধে অসভ্য অবস্থায় মানুষের মনে যা ভয়, যা ধোঁয়া ছিল তাই রয়ে গেল। এখন আমাদের এই ভয় ও ধোঁয়া দূর করবার সময় এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের নামে যে সব অতিরিক্ত দাবী করা হোত, আজ ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে গুহ্য-ধর্ম্মের নামে এই দাবী

ফেলি। ধরুন জীবতত্ত্ব ; কোনো সাহিত্যিক, বার্গসন যেভাবে ও যতটুকু জীবতত্ত্ব বোঝেন, তার বেশি তাকে গ্রহণ করতে পারেন না, অন্তত গ্রহণ করতে দেখিনি। আজ-কালকার ল্যাবরেটারীর বৈজ্ঞানিকের জীবতত্ত্ব সংক্রান্ত মতামত গ্রহণ করলে সাহিত্য-ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয় মনে করি, কেননা physico-chemical method কিংবা monism, সাহিত্যের যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ spiritual variety of personality তার বিরোধী। সাহিত্যিকের জীবতত্ত্বে প্রাণধর্ম্মটুকু থাক্‌বে, আর সে প্রাণ একটি অখণ্ড আবিষ্কারের মতন প্রতীয়মান হবেই হবে। কোনো দার্শনিককে অভিব্যক্তিবাদ গ্রহণ করে আলেক্‌জাণ্ডার কিংবা বার্গসনের বেশি কিছু বলতে শুনেছেন? যদি কোনো সাহিত্যিক নব্য মনোবিজ্ঞান স্বীকার করতে চান, তাহলে তাঁকে Gestalt school-এর মূলসিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, নচেৎ personalism কিংবা introspectionism,—খাঁটি behaviourism তাঁর সয় না। আমি কোনো কথা জোর করে বল্‌ছি না, তবে মনে হয় এইটাই স্বাভাবিক। পরে কি হবে জানি না, আপাতত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যা দশা তাই থেকে এই মনে হয়। পরে কি হবে তখন দেখা যাবে ; এখন যা চলছে তাতে যা মনে হয় তাই লিখছি। এর কারণ কি? গ্যেঠের ভাষাতেই বলি, একটার সঙ্গে অন্যের elective affinity আছে। এই আন্তরিক সম্বন্ধটুকু গোঁজামিল নয়। তার মূলে আছে সাহিত্যিকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরালম্ব হবার অক্ষমতা, কোন মানুষ কিংবা ঘটনাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেখার অনভ্যাস, এবং সম্পূর্ণভাবে দেখতে যাবার

দুরাশা। ধরা যাক্ প্রাণবাদ ভুল, গেস্টাল্ট ভুল, আর এই ভুলের সঙ্গে সাহিত্যিক সংসক্তি স্থাপিত হলে বিজ্ঞানের কাছে সাহিত্যকে হাস্যাস্পদ হোতে হবে। তাতেও, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ভুল পরে প্রমাণিত হলেও সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হয় না আমার মতে। গ্যেঠের জীবন থেকেই দু'টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—তাঁর archetype theory এবং colour theory। এই দুটোই ভুল প্রমাণিত হয়েছে—তাতে দুঃখ নেই, অন্য লোক রয়েছে সত্য মত বা'র করবার জন্য। তাঁর ভুল মতটা কিন্তু গ্যেঠের মানসিক ধর্ম্মের পরিচয় দেয়। সেই যুগের জ্ঞানের সম্পর্কে গ্যেঠের মতন সাহিত্যিক, দার্শনিক ও অতিমানবের পক্ষে ঐ বৈজ্ঞানিক-ভুলটা করা নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। সে যা হোক্, রবীন্দ্রনাথের মতন কবির পক্ষে বিজ্ঞানের সেইটুকু গ্রহণ করা স্বাভাবিক যেটুকু তাঁর মূল-ধর্ম্মের অনুকূল। সেইজন্যই তিনি সেই সব বিজ্ঞান থেকে উপমা গ্রহণ করেন যাতে আছে space, আছে গতি, ভূমার আভাস। ল্যাবরেটারী-বিজ্ঞানে তাঁর কবিপ্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানের বদলে যদি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের কথা তোলেন তাহলেও আপনার আপত্তি মঞ্জুর হয় না। কোন্ বিশ্বাসটা তিনি বিচারের তুলাদণ্ডে ওজন করেননি? কোথায় তিনি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন? দেশাত্মবোধক গোঁড়ামির বিপক্ষে যখন মারমুখী হ'ন, তখন চটি কেন? চরকার বিপক্ষে যখন তিনি কলম ধরেন তখন সত্যেন দত্তও দুঃখিত হয়েছিলেন, আমি জানি। যখন যান্ত্রিক-সভ্যতা নিয়ে কড়া কথা শোনান, তখন তাঁর বিদেশী অতি-বড় ভক্তেরাও মনঃক্ষুণ্ণ হ'ন। এই দুঃখ রাগ ও

অভিমানের অর্থ কি ? দেশাত্মবোধ, চরকাকাটা, যান্ত্রিক-সভ্যতাও ত' যুগধর্ম্ম ! এর মানে শুধু এই যে, তিনি অরবিন্দের মতনই, আপনি যাকে যুগধর্ম্ম বলছেন, তার প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি, তার স্রোতের বিপক্ষে সাঁতার কেটেছেন। এর মানে এই যে, আপনি যাকে যুগধর্ম্ম বলেন, সেটা নিয়ে তাঁর কারবার নয় ; এর মানে, তাঁর যুগধর্ম্ম 'আমাদের' যুগধর্ম্মের প্রতিকূল। কোন্‌টা ঠিক ? লোকে যখন লড়াই করে তখন শত্রুকে স্বীকার করে। সাদরে গ্রহণ না করলে কিংবা ভুল জানলে তাকে পলায়ন বলতে পারেন না। তিনি সব যুগের ফ্যাসানকেই গালাগালি দেন—হিং টিং ছট্ থেকে দেশাত্মবোধক গোঁড়ামি পর্য্যন্ত। তিনি নেহাৎ ভালমানুষের মতন সরলবিশ্বাসী নন্।

প্রকৃত যুগধর্ম্ম কি—আমরা যে বুঝতে পারি না, তার জন্য দায়ী আমরা। আমাদের মূল্যজ্ঞান শিক্ষিত নয়। তা ছাড়া, 'প্রকৃত' কথাটির দুটি অর্থ আছে, এবং সুবিধা বুঝে কথাটি দুই অর্থে প্রয়োগ করি। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চেয়ে মধ্যযুগের লোকেরা এ বিষয়ে বেশি সজ্ঞান ছিল। যে স্কলাষ্টিসিজ্‌মের আপনি অত বিরোধী তাইতে আছে প্রকৃতির দু'টি সংজ্ঞা ; এক অর্থ, যা দেওয়া রয়েছে কিংবা যা ঘটছে ; অন্য অর্থ—অনেকটা আজ্ঞার মতন। এই আদেশাংশ শেষে প্রত্যেক মানুষের বিবেক এবং মানুষের সাধারণ নৈতিক আদেশের সঙ্গে মিলে যায়। প্রকৃতির আদেশ হয়ে গেল প্রাকৃতিক নিয়ম, সেটা মিশল জাতির আচার ব্যবহারের সারাংশের সঙ্গে, তারপর সেটা হলো ভগবানের আদেশ, তারপর সব পরিণত হলো মানুষের ব্যক্তিগত

বিচার-বুদ্ধি ও বিবেকের সিদ্ধান্তে। অর্থাৎ প্রকৃতি কথাটির ব্যক্তিগত আদর্শের দিকও রয়েছে। কিন্তু এই দিকটা আমরা দেখি না, আমাদের নিজেদের কোন আদর্শই নেই। তাই যুগধর্ম্মও বুঝি না, বুঝি ফ্যাসান। উন্নত আদর্শের দিক থেকে যা হওয়া উচিত আপনি এবং অন্যান্য ভালো লোকে যা বিবেচনা করছেন সেইটাকেই প্রকৃত বলতে আপত্তি থাকা আপনার মতো আদর্শবাদীর পক্ষে শোভন নয়। রবীন্দ্রনাথের মতন লোক যে আদর্শের প্রবর্ত্তন করছেন সেইটাই হবে নবযুগের ধর্ম্ম— অতিমানবে বিশ্বাসী ন্যায়ত তাই বলতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছেন যে, বিজ্ঞান, যন্ত্র, কর্ম্মকুশলতা, শুধু সুচারুরূপে কর্ম্ম-সিদ্ধির উপায় মাত্র। সিদ্ধি কি করে হবে তাও তিনি ইঙ্গিত করেছেন, অবশ্য গুরুর মতন গুরুগম্ভীর ভাষায় কারুর কাণে মন্ত্র দেননি। উপায়ের চাপে উদ্দেশ্য শুকিয়ে যাতে না যায়, সেইটাই জোরে বলেছেন। তাঁর মতে সত্য হচ্ছে পার্সন্যালিটি। এই সত্যটি যতই রবীন্দ্রনাথের লেখায় ধরা পড়ছে ততই মনে হচ্ছে যে, তিনি আমাদের সকলের একমাত্র আশা-ভরসা। এই সত্যের প্রচারই হলো যান্ত্রিক-সভ্যতার বিপক্ষে একমাত্র প্রতিবাদ। এটা challenge— পলায়ন একেবারেই নয়। এইটাই নবযুগের বোধন-বাণী। যে নবযুগ আনবে আনবে বলে চেঁচায় সে পুরাতন যুগের রোগচিহ্ন মাত্র।

বাধা-সৃষ্টির দ্বারা স্রষ্টাকে সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া যুগধর্ম্মের অন্য কাজও থাকতে পারে। এক রকম সাহিত্য থাকতে পারে যাকে Edwin Muir-এর

ভাষায় literature of escape বলতে পারেন। আপনার খোলা চিঠির প্রথম প্যারাগ্রাফে Moore থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন। ঐ নামের এক ব্যক্তি Utopia রচনা করেছিলেন। তার নাকি সাহিত্যিক মূল্যও আছে। ফ্রান্সিস্ বেকনের মতন লোকও ঐ ধরণের কি একটা বই লেখেন—অথচ তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্ত্তক, মন্ত্রী, ঘুষখোর, এক কথায় —জীবন থেকে তিনি পালাননি—এক জেলে কয়েকদিনের জন্য যাওয়া ছাড়া। ঐ Edwin Muir থেকেই এই ধরণের সাহিত্য সম্বন্ধে গোটাকয়েক দামী কথা তুলে দিচ্ছি; "For escape is one way of saving oneself from being overwhelmed by the suggestion of the age, and of penetrating to a source of inspiration deeper than it. . . . The defect of the literature of escape is that it is too sweeping; it has neither the exactitude nor the practical temper of the literature of conflict. It postulates only two things; its vision of truth and beauty, and a world which does not correspond to that vision. Yet its criticism may be profound as far as it goes, for it apprehends the problem in its full and appalling form, though it can find no solution."

—এই ইংরেজী বুক্‌নীর সার্থকতা আমার কাছে নেই, কেননা আমি, কেউ পালাতে পারে বিশ্বাস করি না, —ভলটেয়ারও পারেননি, রোমাঁ্যা রোলাও পারেননি, টলষ্টয়ও পারেননি, — ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান

ভানে। আর আমি পলাতক-সাহিত্য বলে সাহিত্যের নতুন শ্রেণী আবিষ্কার করতে রাজি নই। আপনার কাছে এর সার্থকতা হয়ত থাকতে পারে, কেননা সাতত্যের চেয়ে বিরতিরই আপনি বেশি পক্ষপাতী, এবং প্রয়াণকে কাপুরুষজনোচিত পলায়ন বিবেচনা করেন। অরবিন্দের পণ্ডিচেরী-প্রয়াণ ও রবীন্দ্রনাথের বিদেশ-ভ্রমণ এই যুগের, এই দেশের, এই যুগের ধর্ম্মের সব চেয়ে বড় নিষ্ঠুর সমালোচনা—অন্তত এ কথা মানুন, যদি তাঁরা এযুগের জন্য নতুন কিছু নাই করছেন ভাবেন। নবযুগধর্ম্ম রচনারও যেমন প্রয়োজন, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের আলোচনাও তেমনি প্রয়োজন। নয় কি?

শুধু যুগধর্ম্ম নিয়েই এক যুগ কাটালাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, নাতিদীর্ঘ চিঠি লিখব। হয়ে গেল অতিদীর্ঘ চিঠি। এর পর অন্যান্য বিষয় নিয়ে তর্ক করে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি করব না। আপনার খোলা চিঠিতে অন্তত একশ'টা আলোচ্য বস্তু রয়েছে। সেজন্য মূল বক্তব্যটি পরিস্ফুট না হলেও, তাদের ওপর আপনার চিন্তাধারার একটা ছায়া পড়েছে। আপনি যে ঐ সব জিনিষ নিয়ে ভাবছেন, এইটাই বড় কথা, এবং হয়ত আমার একটা ছোটো চিঠির অজুহাতে আপনার চিন্তাধারা যে খুলে গিয়েছে এইটাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। চিন্তাশীলতার দামও কম নয়। আমি নিজে যখন লিখি তখন আপনার মত নই আমার মস্তিষ্কে হাজার হাজার fringe thoughts এসে হাজির হয়, ভিড় করে প্রধান কথাটিকে ঠেলে দেয়। অনেকে উপমা বদলে বলেন; ভূতের মতো উপদ্রব করে যজ্ঞ নষ্ট করে। চালাকি করে নিজেকে সমর্থন করি,

ভাবি—যজ্ঞ না করার চেয়ে, কিংবা একলা ঘরে চুপ্‌টি করে একটা তরকারীর ভূরিভোজন করার চেয়েও কাজটা মন্দ নয়। এই ধরণের চিন্তাকে অপরিষ্কার বলতে বাধ' বাধ' ঠেকে। এক ধরণের মস্তিষ্কের অভ্যাসই এই যে, চিন্তার বিষয়কে চার ধার থেকে দেখে দেখে একটি বিষয়ের নানা দিক একই সঙ্গে চোখে পড়ে। সকলেই কি অ্যারিষ্টট্‌লের যুক্তিরীতি মুখস্থ করে ভাবে? বেশিরভাগ লোক ভাবে ideogram-এর পদ্ধতির মতন, একটা বাক্যের ওপর আর একটা বাক্য চাপিয়ে, যেন পিকাসোর বেহালার ছবি। একটির পর একটি বাক্য সাজিয়ে লেখা কারুর ধাতে আসে, কারুর আসে না। আমি নিজের দোষ সম্বন্ধে সচেতন বলে আপনার লেখার দোষ দেখতে নিরস্ত হলাম। এই দেখুন না, বই থেকে, বিশেষ করে বিলেতী বই থেকে, লম্বা কোটেশন্‌ দেওয়াটাও আমার অভ্যাস। আপনারও সে-অভ্যাস আছে দেখছি। ভালই হয়েছে; যে কুকুর কামড়েছে তার রোঁয়া নাকি মস্ত দাওয়াই, তবে তাতে রোগ সারবে বলে মনে হয় না। এই চিঠিতেই দেখুন না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না। মধ্যযুগের চিন্তাধারা নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। বর্ত্তমান দর্শনে Neo-Thomism নামে একটা ঝোঁক এসেছে। ঝোঁক দিয়েছেন বোধ হয় জ্যাক্‌ ম্যারিটেন্‌। এই ভদ্রলোকটি একজন চিন্তাশীল লেখক—বিলেতেও এঁর চেলা হচ্ছে। এঁদেরকে neo-scholastics বলা হয়। আমার এইটুকু বিদ্যা নিয়ে জোর করে তাঁদের

সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা যায় না। শুধু বলা যায়, neo-scholasticism মানে মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া নয় কিংবা সেই যুগের বিজ্ঞানকে চরম জ্ঞান ভাবা নয়, সেটা এই যুগে থাকবারই কথা, সেটা বিজ্ঞানের বিরোধী নয়, শুধু জড়বাদ ও যন্ত্রবাদের বিরোধী, সেটা খুবই বুদ্ধিবাদী, সেটা অভিব্যক্তি-বাদকে অস্বীকার করে না, ঐ বাদের উপর যে ঝুটা দর্শন খাড়া করা হয়েছে সেই দর্শনকে প্রতিবাদ করে, সেটা বৈজ্ঞানিক রিসার্চ্চকে শক্তির অপব্যয় ভাবে না, শুধু বিজ্ঞান জীবনের যে অংশ বাদ দিয়েছে—অর্থাৎ value-র দিকটা (তাঁদের ভাষায়—ধর্ম্মের দিকটা) সেইটে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানের দাম্ভিক অদ্বৈতাংশটুকুর প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদ করা ছাড়াও তার দু'চারটা নতুন কথা বলবার আছে, এই যেমন theory of knowledge নিয়ে, দেহ মনের সম্বন্ধ নিয়ে, সত্যের সত্তা নিয়ে। Pragmatism কিংবা romantic idealism-এর বিপক্ষেও এই দলের ভীষণ আপত্তি। এঁদের দ্বৈতবাদী বস্তুতত্ত্ব নেহাৎ বাজে জিনিষ নয়, কিংবা মধ্যযুগে ফিরে যাবার জন্য মন কেমন কেমন করাও নয়। আর্ট সম্বন্ধেও এঁদের অনেক কথা প্রণিধানযোগ্য।

তাহলে দাঁড়াল এই, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের তাড়নায়, যোগধর্ম্ম, গুহ্য-ধর্ম্ম কিংবা অনুভূতিকে যদি গ্রহণ করতে নারাজ হ'ন, তাহলে সেই সঙ্গে আরো কিছু ত্যাগ করতে হবে। প্রথমে এইটুকু আমি বুঝেছি। তা ছাড়া আরো বুঝেছি যে, বুদ্ধিমান হলে আধুনিক হোতে হবে কিংবা মধ্যযুগ কি পূর্ব্বতন যুগকে

পরিত্যাগ করতে হবে তাও নয়। যুগধর্ম্ম বলতে যুগ কথাটার অর্থও বুঝতে হবে; সেজন্য কাল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর করে তুলতে হবে। তারপর ধর্ম্ম, সেটা নির্ভর করছে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধের ওপর। অর্থাৎ একধারে পার্সন্যালিটি, অন্যধারে কাল।

এই বার শেষ করি। ইতিমধ্যে, অর্থাৎ 'যোগধর্ম্মের যুক্তির' পর, একাধিক প্রবন্ধ লিখেছি। পুস্তকও বেরিয়েছে, তবে ইংরেজী ভাষায়। আশা করি, আপনার ভাষাবিদ্বেষ নেই। আচ্ছা, এই Neo-Thomist-দের দু'চারটা কথা শুনে নিলে দোষ কি? আমি তাঁদের গোঁড়া শিষ্য নই, বলা বাহুল্য। *

পুঃ—অনুগ্রহ করে মধ্যযুগকে অন্ধকারের যুগ বলবেন না, যেমন মেট্‌ল্যাণ্ডের এক ছাত্র ভেবেছিল। বল্লে, মেট্‌ল্যাণ্ডের উত্তর শুনতে পাবেন—It is dark to you.

বৈশাখ, ১৩৩৯

---

* অধ্যাপক ম্যাক্‌মারে 'Some Makers of the Modern Spirit' নামে এই সেদিন একখানি পুস্তক সঙ্কলন করেছেন। তাইতে মধ্যযুগের দান সম্বন্ধে অনেক সারবান কথা আছে। পরিশীলন, উৎকর্ষ কিংবা কৃষ্টির দিক থেকে মধ্যযুগে যে ঐক্য সাধিত হয়েছিল সেটি বর্ত্তমান যুগে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে বলে য়ুরোপীয়ানরা আপশোষ করছেন। বলা বাহুল্য, তাকে ধর্ম্মগত ঐক্য বলে ছেড়ে দিলে চল্‌বে না। একোয়াইনাসের বুদ্ধির প্রাধান্য প্রচার করার প্রয়াস দেখেই বোধ হয় হোয়াইট-হেডের মতন নব্য-নৈয়ায়িক বলেছেন যে মধ্যযুগই ইতিহাসের সব চেয়ে ন্যাসান্যালিষ্ট যুগ। ইতিহাস অর্থে য়ুরোপীয়ান ইতিহাস; আপনিও তাই বিশ্বাস করেননা কি? অগ্রহায়ণ ১৩৪০।

সাহিত্যিকা

সাহিত্যিকের যুক্তি
তথা সাহিত্যে মিথ্যাবাদ
সমাজধর্ম্ম ও সাহিত্য
বিশ্ব-কবি

সাহিত্যিকের মুক্তি
তথা
সাহিত্যে মিথ্যাবাদ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আদর্শবাদী ও বস্তুতন্ত্র-বাদীর মধ্যে দলাদলির কারণ শুধু অর্থসমস্যা, কি প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা, কিংবা শক্তিহ্রাসের ভয়,—এক কথায়, সাহিত্যিক ব্যবসায়ে লাভালাভ, বোল্লে চলে না। আমার মনে হয় যে, সাহিত্যিক প্রতিপত্তি দলাদলির পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা হলেও সেটি অন্য গূঢ় কারণের নিদর্শন মাত্র। গূঢ় কারণটি নির্দ্ধারণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কার্ল মার্ক্‌সের ব্যাখ্যা আমি ইতিহাস ও রাজনীতির ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বীকার করি না, সাহিত্য-ক্ষেত্রে ত' দূরের কথা। অবশ্য, আর্থিক বৈষম্য ও সেই সঙ্গে শ্রেণী বিরোধের ফলে সাহিত্যের রূপ খানিকটা নির্দ্ধারিত হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা দলাদলির পটভূমি কিংবা অবস্থান মাত্র।

গোড়ার কথা এই যে, সত্যের প্রতি মনোভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিষ্টের অনেক প্রভেদ রয়েছে। দু'জনেই মানুষ বোলে, গোটাকয়েক যন্ত্র-তন্ত্র সাধারণ হতে বাধ্য—যেমন মন ও দেহ। তবে আর্টিষ্ট-মনের কাজের বৈশিষ্ট্য আছে, এবং আর্টিষ্টের দেহের প্রক্রিয়াও কিছু অন্য ধরণের। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিষ্টের মিলের চেয়ে গরমিলই আমার কাছে এক্ষেত্রে দরকারী কথা। এক কথায়, তফাৎ হচ্ছে, সাধারণ মানুষের মন অশিক্ষিত এবং আর্টিষ্টের মন সুশিক্ষিত। তর্ক উঠতে পারে

যে, বৈজ্ঞানিকের মনও শিক্ষিত, অতএব গরমিল শুধু আর্টিষ্টের সঙ্গে নয়, বৈজ্ঞানিকেরও সঙ্গে। কিন্তু 'বৈজ্ঞানিক মন' বোলে কোন মনের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় ন্যায়ত স্বীকার কোরতে পারেন না, কেননা তাঁরা চোখ, কান এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ মনের দ্বারকে প্রথম থেকে শেষ অবধি সন্দেহ করেন। বিজ্ঞান-পদ্ধতির প্রক্রিয়া হচ্ছে বস্তু কিংবা ঘটনার সঙ্গে মনের ছোঁয়াচ না লাগতে দেওয়া। যতক্ষণ না প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক এক একটি আইনষ্টিন্ হচ্ছেন, ততক্ষণ বৈজ্ঞানিকের মন সাধারণ ব্যক্তির মন থেকে একেবারে ভিন্ন জাতির হবার আবশ্যক নেই। অতএব আমাদের দু'টি কাজের হিসাব নিতে হবে। একটি সাধারণ ব্যক্তির মনের, এবং অন্যটি আর্টিষ্টের।

মানুষের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির মিলনও চলছে, বিরোধও ঘটছে। এই দ্বৈত সম্বন্ধের ফলে, মন ও বুদ্ধি উৎপন্ন না হলেও, মন ও বুদ্ধি যে সজাগ, ক্রিয়াশীল, এবং প্রখর হয়ে ওঠে তা অস্বীকার করা যায় না। তার ওপর আবার অন্তঃপ্রকৃতিও রয়েছে। ভিতরের এই জড়প্রকৃতি মধ্যে মধ্যে এমন বাধা তোলে যে, মন ও বুদ্ধি (mind) সেই বাধাগুলিকে সোজাসুজি অতিক্রম না কোরতে পেরে গলি দিয়ে পাশ কাটাতে চায়, কিংবা বাধা-বিপত্তির আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে পড়ে। গলিগুলি নিতান্তই বাঁকা এবং কোথাও নীচু, কোথাও উঁচু। এইরূপ অসমতল ক্ষেত্রের মধ্যে মানসিক বক্রগতির ইতিহাস সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করা যেতে পারে যে, সেইরূপ বাঁকা পথ অবলম্বন কোরে, কিংবা তার ধারে কোন

অলিগলিতে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম লাভ কোরে, মনের অনেক প্রবৃত্তিকে সাময়িকভাবে বশে আনা যেতে পারে, কিন্তু গন্তব্য স্থানে, অর্থাৎ যথার্থ কিংবা সার্থক-সত্যে পৌঁছান যায় না। মনের সাময়িক বিশ্রাম-জনিত সুখকে সত্যোপলব্ধির পরম আনন্দ বোলে মনে হওয়াই শ্রান্ত পথিকের পক্ষে স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি কিন্তু ইয়ুলিসেসের মতন আরামকে অগ্রাহ্য কোরে অগ্রসর হতে পারে সেই বেঁচে গেল, নচেৎ মিথ্যার কুহকে চিরকাল ভেড়া হয়েই রইল। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দু দার্শনিক মন ও বুদ্ধিকে অত নীচু স্তরে রেখেছেন। এই জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ আর্টের ব্যাখ্যায় মন ও বুদ্ধির উল্লেখ না কোরে আত্মারই উল্লেখ করেন। মন ও বুদ্ধির কাজে জুয়াচুরি থাকবেই থাকবে—কেননা তাদের রাস্তা, গলিঘুঁজি; আত্মার বিকাশে জুয়াচুরি নেই, তার রাস্তা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর মতই সোজা ও চওড়া। সাধারণ ব্যক্তির ও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আর্টিষ্টের তফাৎ এইখানে। সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে আত্মার বালাই নেই,—কেবল দেহ, মন ও বুদ্ধির সঙ্গেই তার কারবার, এবং আর্টিষ্টের কারবার দেহ, মন, বুদ্ধি, এবং আত্মার সঙ্গে। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে মনে হয় যে, সাধারণ ব্যক্তির মূলধন বুদ্ধি, ও আর্টিষ্টের মূলধন আত্মা, অতএব যেন আর্টিষ্টের গড়নই আলাদা। অতএব সাধারণ ব্যক্তি যে বাধা-বিপত্তি ও বৈষম্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, সে বাধা-বিপত্তি ও বৈষম্যের মধ্যে আর্টিষ্টের হারিয়ে যাবার ভয় নেই। আর্টিষ্টও বুদ্ধিমান জীব—তারও মন আছে, সেইজন্য সে ফাঁকি তৈরি করে, কিন্তু তার মন, বুদ্ধি ও আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

বোলে নিজে সহজে ফাঁকে পড়ে না। মোদ্দা কথা এই যে, এ জগতে একমাত্র আর্টিষ্টই গোটা মানুষ।

কোন জিনিষের স্বরূপ অর্থাৎ যথার্থ কিংবা সার্থক সত্যকে সহজে বুঝতে না পেরে মানুষের বুদ্ধি সত্যের তিনটি মূর্ত্তি খাড়া করে।* প্রথমটি সদৃশ সত্য (Fiction) কিংবা কাল্পনিক সত্য, দ্বিতীয়টি আনুমানিক সত্য, (Hypothesis) এবং তৃতীয়টি অনুমোদিত কিংবা গৃহীত সত্য (Dogma)। এই ত্রিমূর্ত্তির পূজা প্রত্যেক বুদ্ধিমান জীবই কোরে থাকেন—কি বৈজ্ঞানিক, কি তথাকথিত সাহিত্যিক। তবে পূজার রীতি-নীতি, বিধি-ব্যবস্থা দুই জনের মধ্যে পৃথক হয়; হতে বাধ্য, কেননা উপাদান ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। সেইজন্যই সাহিত্য-স্রষ্টার ও বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিগত চিন্তাধারার রীতি-নীতি ভিন্ন মনে হয়। কিন্তু যেকালে সব আর্টিষ্টেরই মন ও বুদ্ধি আছে, এবং সে মন ও বুদ্ধি আত্মার অধীন, এবং যেকালে বস্তুর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম কোরে রসসৃষ্টির জন্য আত্মার ও জড়ের কোন না কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করা চাইই চাই, তখন সর্ব্বপ্রকার রসস্রষ্টার সৃজন-নীতি প্রধানত এক হতে বাধ্য, যদিও রূপের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক।

সদৃশ সত্যের গোটাকয়েক দৃষ্টান্ত দিচ্ছিঃ রাজনীতির ক্ষেত্রে রুষো ও হব্‌সের কল্পিত মানব সমাজের আদিম

* আমার সমালোচনার বিষয় আর্ট নয়, আর্টিষ্ট এবং তাঁর চিন্তাধারা ও কার্য্যাবলী। বৈজ্ঞানিক সমালোচনা, অর্থাৎ ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন সমালোচনা আমি ভাল বুঝি না। Vaihinger তাঁর Philosophy of As If বইখানিতে সাধারণ মনের এই সব জুয়াচুরির কথা ভাল কোরেই জানিয়ে দিয়েছেন।

অবস্থা; অর্থনীতিতে আডাম্ স্মিথ্-কল্পিত স্বার্থপর ও স্বার্থান্বেষী সাধারণ ব্যক্তি; সমাজতত্ত্বে গড়পড়তা সুস্থ মানুষ; বিজ্ঞানে পরমাণু; জীববিজ্ঞানে গ্যেঠে-কল্পিত জীব-জন্তুর একমাত্র মূল আদর্শ (the animal archetype) প্রভৃতি। সাহিত্যে ঐ প্রকার গোটাকয়েক কল্পিত অর্থাৎ সদৃশ সত্যের সন্ধান পাই। যেমন, প্রত্যেক ব্যক্তি হচ্ছেন প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত পুরুষ (আদর্শ-বাদীর গোড়ার কথা), এবং প্রত্যেক ব্যক্তি হচ্ছেন ভিতরের ও বাইরের প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ জীব (বস্তুতন্ত্রবাদীর গোড়ার কথা)—অর্থাৎ মানুষ হয় ভগবানের বংশধর, না হয় ভূগোল কিংবা সয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সদৃশ তথা কল্পিত-সত্যে সুস্থ মানুষের মন বসে না, সে তাই সত্যের সন্ধানে আরো এগিয়ে পড়ে। ফলে হয় আনুমানিক সত্য-সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত, যেমন ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ। সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত যেমন—প্রত্যেক মানুষই নিজের ইচ্ছাশক্তিতে কিংবা ভগবৎ-কৃপায় প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত হচ্ছে (আদর্শবাদী), এবং কোন মানুষই এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে না (বস্তুতন্ত্রবাদী)।

শোনা যায়, অসুস্থ ব্যক্তি, মৃগীরোগী, কিংবা উন্মাদের দল যথার্থ-সত্যে সাধারণত পৌঁছতে পারে না, কিন্তু দেখা যায় যে বেশির ভাগ তথাকথিত সুস্থ লোক আনুমানিক সত্যেই জমে গেল। তখন সদৃশ্য-(কল্পিত) সত্য ও আনুমানিক সত্যের সাহায্যে বেশির ভাগ লোক যে নতুন সত্য অনুমোদন ও গ্রহণ

করে তার প্রকাশভঙ্গী এইরূপ ঃ—অতএব যে ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ গ্রহণ করল না সেই গোঁড়া ধার্ম্মিক (সার্ আর্থার কীথের সেদিনকারের বক্তৃতা); অতএব সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম্ম হচ্ছে চরিত্রকে দেবোন্মুখ কিংবা পাতকী অঙ্কিত করা ; অর্থাৎ, একমাত্র প্রকৃতির অতিরিক্ত মানুষ (দেবতার আত্মীয়), কিংবা একমাত্র প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ জীব (সয়তানের আত্মীয়) হিসাবেই মানুষকে বোঝা যাবে। এখন, দেবতার প্রকাশ হয় অনুভূতির মধ্যে, এবং পাতকীর প্রকাশ তার প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজে, দৈনন্দিন ঘটনায় ; এই যুক্তি অনুসারেই একটি গৃহীত সত্যের (আদর্শবাদের) প্রকাশভঙ্গী অনুভূতিমূলক, অন্যটির (বস্তুতন্ত্রবাদের) প্রকাশভঙ্গী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ-সাপেক্ষ হয়। একটি হয়ে ওঠে দিব্যদর্শন, অন্যটি বিজ্ঞান ; একটি কুলীন, অন্যটি শূদ্র। দৃষ্টান্ত, অনুরূপা দেবী, যতীন সিংহের সাহিত্যালোচনা, এবং জোলার বস্তুতন্ত্রের ব্যাখ্যা।

অথচ, জীববিজ্ঞানের যথার্থ সত্য হচ্ছে ডারুইনের Struggle for Existence (মৎস্য ন্যায়), ক্রপ্‌টকিনের Mutual Aid, ডী ভ্রিজের Mutation, সব মিলিয়ে এবং হয়ত তারও অতিরিক্ত একটি জীবনী-শক্তির প্রকাশ; অথচ সাহিত্যের একমাত্র কর্ত্তা ও কর্ম্ম মানুষ, যে একাধারে দেবতা, সয়তান ও নিতান্ত সাধারণ, এবং যে মানুষ বোলেই কখনও কখনও বিজ্ঞানসম্মত এবং সাধারণের ব্যবহৃত পথের বাইরে যূথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

এ ত' গেল দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্তের দ্বারা অনেক সময় ভিতরের কথাটা বোঝা যায় না। কাল্পনিক (সদৃশ)

সত্যের ধরণ এই যে, সে-সত্যের সঙ্গে ব্যবহারিক জগতের অর্থাৎ বাহ্য ঘটনা ও অভিজ্ঞতা এবং মানসিক জগতের প্রয়োজনীয় চিন্তাধারার আন্তরিক বিরোধ থাকতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে এই বিরোধ দূর করবার, এই উৎকট প্রসারণের, এই মানসিক অশান্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার বাসনা সদৃশ-(কাল্পনিক) সত্যের রূপের মধ্যে থাকবেই থাকবে, প্রকাশ্যে কিংবা অ-প্রকাশ্যে। (বস্তুতন্ত্রবাদীর অঙ্কিত পাষণ্ডের মধ্যেও একটি ছোট্ট মেয়ে না হয় একটি কুকুরের ওপর মমতায়, এবং আদর্শবাদীর অঙ্কিত মহাত্মার চরিত্রে একটি নির্দ্দোষ খেয়াল কিংবা একটি মিথ্যা কলঙ্কের চিহ্নে পূর্ব্বোক্ত বিরোধ ও তার অবসানের বাসনাধরা পড়ে)। কল্পিত সত্যের কল্পনাটুকু স্রষ্টার কাছে সর্ব্বদা প্রকট থাকলেই বুদ্ধির পক্ষে ভাল। কাল্পনিক সত্যের একমাত্র গুণ, বুদ্ধির সুবিধা ও উপকার, কেননা তার দ্বারাই বুদ্ধি অনুমান ও অনুমোদন কোরতে অগ্রসর হয়।

কাল্পনিক সত্যের ও আনুমানিক সত্যের উৎপত্তি এবং আকার অনেক সময় একই প্রকারের। আকার এক হলে গোলমালের সম্ভাবনা বেশি। আদিম মানব কামুক ও ক্ষুধার্ত্ত, কিংবা ধার্ম্মিক এবং ব্রহ্মচারী; (আমাদের সভ্যতা মানবের আদিমত্বকে দূর কোরতে মোটেই পারেনি); এবং (অতএব) কাম ও ক্ষুধা কিংবা সংযম অথবা ব্রহ্মচর্য্য সব মানুষেরই আদিম (যথার্থ) প্রবৃত্তি—এই দু'টি বাক্যের তাৎপর্য্য পৃথক হলেও বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে একই আকার ধারণ করেছে। কিন্তু অনুমান সর্ব্বদাই সত্য বোলে প্রমাণিত

হবার জন্য প্রস্তুত। প্রত্যেক অনুমান, এক একটি চ্যালেঞ্জ, যুদ্ধং দেহি হাঁক ছাড়ছে। অনুরূপা দেবীর চরিত্রগুলি যদি কারুর অ-সত্য বোলে মনে হয়, গ্রন্থকর্ত্রী অতি সহজেই উত্তর দিতে পারেন, 'মানুষ যে দেবতার বংশধর এই কথাটির ওপর আগে জীবন গড়ে তুলুন, একবার নিজে মহাত্মা ও মুক্ত পুরুষদের সঙ্গে মিশুন, একবার সাদা চোখে মানুষকে দেখুন, তাহলেই বুঝবেন আমার চরিত্রগুলি সত্য কি কল্পনাপ্রসূত। তাও যদি না করেন, তাহলে প্রমাণ করুন যে, মানুষ পুরুষকারের দ্বারা কিংবা গুরুর কৃপায় নিজেকে উন্নত কোরতে পারে না।' তেমনি ডাঃ নরেশচন্দ্র রস-সমালোচককে বোলতে পারেন, 'একবার দুচোখ খুলে বেড়াবেন, দেখবেন মানুষের মন ও দেহ এক-একটি কুরুক্ষেত্র। নেহাৎ না পারেন, প্রমাণ করুন যে ঐ প্রকার বদ্ধজীব পৃথিবীতে নেই, কিংবা এতই দুর্লভ যে, যাদুঘরের কাচের ভেতর রাখা ছাড়া নভেল নাটকের পাতায় আনা যায় না।' রামচন্দ্র ও ক্যাসানোভা দু-এরই অস্তিত্ব আছে, সেইজন্য রামায়ণ ও কামায়ণ লেখা দুই-ই অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ—তবে যার যেমন অভিজ্ঞতা। কোন অনুমানই নিরীক্ষণের ভয় পায় না। আদর্শবাদীর যন্ত্র দূরবীক্ষণ, বস্তুতন্ত্রবাদীর অণুবীক্ষণ, একই যন্ত্রের উল্টো দিক্‌টা। যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষিত হলেই আনুমানিক সত্যকে যথার্থ-সত্য বিবেচনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু যন্ত্র কিছু অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত ফল দেখায় না—এ কথাটি সকলেই ভুলে যান্। সেইজন্য আনুমানিক সত্যকে অনেক সময় যথার্থ-সত্য

বোলে ভ্রম হয়। আনুমানিক সত্যের অনুমান-অংশটুকু যন্ত্র অথবা অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথর দ্বারা পরীক্ষিত হলেই, সন্দেহাংশটুকু বিশ্বাসের দ্বারা দূরীভূত হলেই, আনুমানিক সত্য অনুমোদিত (dogma) সত্যের কোঠায় উঠে পড়ল।

অতএব কাল্পনিক সত্যের উৎপত্তি এবং মাপকাঠি নির্দ্দেশের পক্ষে যেমন সুবিধার বস্তু, আনুমানিকের সুবিধা তেমনি সম্ভাবনীয়তায়। মানুষকে অতিপ্রাকৃত আঁকবার সুবিধা যে কত সকলেই জানেন—অলৌকিক ঘটনার অবতারণা থেকে আরম্ভ কোরে পূর্ব্বপরিচিত ধর্ম্ম ও মধুর ভাবের সমাবেশ পর্য্যন্ত সবই সুবিধার। রবিবাবুর অনুকরণে দু-চারটা ভূমা, দু-চারটা বাণী, অজানা আনন্দের ঝিলিক্ প্রভৃতি কথা লেখার মধ্যে ছিটিয়ে দিলে অতি সহজেই আদর্শবাদী সাহিত্যিক বোলে প্রতিপন্ন হওয়া যায়। আবার শরৎবাবুর অনুকরণে (?) ঘেয়ো কুকুরের ডাক, প্যাঁচার আওয়াজ, ঘেঁটুফুল ও বস্তীর দুর্গন্ধ, বেশ্যাবাড়ীর কাঁক্ড়া চড়চড়ির ছিব্ড়ে, গল্পে আনলেই বাস্তবপন্থী নাম কেনা অতি সহজ হয়ে ওঠে। দুইই সম্ভব ঘটনা, ভূমার আভাস এবং বস্তীর গল্প। কিন্তু দুই প্রকার সাহিত্যিকই, যাঁরা যথার্থ-সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, অর্থাৎ রবিবাবু ও শরৎচন্দ্রের বহুদূরে পড়ে রইলেন। কল্পনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ কোরলেই, অর্থাৎ ন্যায্য হলেই, কাল্পনিক সত্যের কাজ ফুরাল। কিন্তু আনুমানিক সত্যকে ঘটনাপারম্পর্য্যের মধ্যে আবিষ্কার কোরতে হয়, কতখানি যথার্থ-সত্যের নিকটবর্ত্তী হয়েছে সর্ব্বদাই চোখ রাখতে হয়, অর্থাৎ প্রমাণসাপেক্ষ এবং সম্ভব কি না দেখতে হয়। এখানে অভিজ্ঞতাই একমাত্র

পরীক্ষক। নতুন অভিজ্ঞতা যদি পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রতিকূল হলো, তাহলে আনুমানিক সত্যকে তৎক্ষণাৎ বর্জ্জন কোরতে হবে—একটি মাত্র অভিজ্ঞতা যদি পূর্ব্বতন অনুমানের বিপক্ষে যায়, তাহলে পুরাতন অনুমানকে অগ্রাহ্য কোরতে হবে। কল্পনার ও বালাই নেই, তার পরীক্ষক ঘটনা নয়—একটি কল্পনার সঙ্গে অন্য কল্পনার বিরোধ না ঘটলেই হলো, কিংবা সূত্র জড়িয়ে না গেলেই হলো। তাহলেও কাল্পনিক সত্য অগ্রাহ্য হবে না—জোর mixed metaphor, জংলা মিশ্র সুর, arabesque, grotesque, eclectic আর্ট হবে। তবে এ সবেও কল্পনার ধর্ম্ম বজায় রাখা চাই—'গাঁজা, গুলি, ভাঙ্'এর সঙ্গে 'সুতরাং' মেলান চাই।

যদি কল্পনার ধর্ম্ম রক্ষিত হলো, যদি অনুমান সব চেয়ে অধিকসংখ্যক অভিজ্ঞতাকে বরণ কোরতে পারলে, তাহলে কল্পনা ও অনুমান গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। তখন আগেকার পন্থাগুলি ঐতিহ্যে পরিণত হয়। একবার যা' তা' কোরে কল্পনা ও অনুমানকে ঐতিহ্যে পর্য্যবসিত কোরতে পারলে সেই গোড়ার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। সত্য গৃহীত হলেই মানুষ নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ কোরতে পারে, কেননা তখন আর সুবিধা-অসুবিধা, ন্যায্য-অন্যায্যর কথা থাকে না। এই প্রকার মানসিক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি অনেকটা কাজীর বিচার, কিংবা হিন্দুমুসলমান প্যাক্টের মতন। বীরবলের ভাষায়, শেষে প্যাক্টই হয়ে যায় ফ্যাক্ট, গোড়ার সেই ট্যাক্টের কথা সকলেই ভুলে যায়—কেননা গোলমেলে জিনিষ ভুলে যাওয়াই বুদ্ধির ধর্ম্ম। মানুষ নিজের সৃষ্ট ফ্যাক্টকে ধূপ ধুনা দিয়ে অর্চ্চনা করে, পেঙ্গুইন

দ্বীপের Saint Oberosia-র ছাইএর মতন। তখন প্যাক্‌ট ও ফ্যাক্‌টটি আদর্শে বেমালুম রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। যে সেই আদর্শকে গ্রহণ কোরলে না, সেই পাজী, অ-সাহিত্যিক; যে কোরলে সেই প্রকৃত ভক্ত, রসিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি। অর্থাৎ ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের মতে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ভ্রান্ত এবং শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর মতে ভূদেব চন্দ্রের পরবর্ত্তী সব লেখকই পাষণ্ড (heretic)। কিন্তু দুজনেই গোঁড়া; একজন কাল্পনিক সত্যকে যথার্থ-সত্য বোলে ধরে নিয়েছেন, অন্যজন আনুমানিক সত্যকে সার্থক-সত্য বোলে ধরে নিয়েছেন। সেইজন্য দুজনের কারুর মনে কোন প্রকার সন্দেহ নেই—দুজনেরই মনে শান্তি বিরাজ কোরছে। দুজনেই আত্মতৃপ্ত। তা না হলে মতামতগুলি অত জোরের সঙ্গে কেউ বোলতে পারে!

এক পারেন আর্টিষ্ট। জনকয়েক এমন লোকের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে যাঁদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য কোরে আমি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে এসেছি। একমাত্র আর্টিষ্টই মন ও বুদ্ধির সঙ্গে প্রকৃতির আদিম দ্বন্দ্বের সমাধান কোরতে পারেন। আর্টিষ্ট কাল্পনিক সত্যের সুবিধা ও আনুমানিক সত্যের প্রয়োজনীয়তা মানেন। তবে তিনি তাদের মধ্যে একটিকেও যথার্থ সত্য বোলে মনে করেন না। তিনি জানেন যে, প্রত্যেক মানুষ, কি সাধারণ কি বৈজ্ঞানিক, ফাঁকি খোঁজে, এবং শেষে ফাঁকিতে পড়ে। তিনি জানেন যে, তাঁকে সত্যবাদী হতেই হবে। সুবিধা যে সুবিধা ছাড়া অন্য কিছু নয়, অনুমানের প্রয়োজন যে যাথার্থ্য নয়, শুধু মনের মিথ্যাবাদ, এ কথা তিনি ভাল রকমই জানেন। রস-সৃষ্টির

আসরে মিথ্যার স্থান নেই—প্রজার মতন, মিথ্যা দরবারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। মিথ্যা যেকালে বুদ্ধির সৃষ্টি, এবং আর্টিষ্ট যেকালে বোকা মানুষ নন, অথচ ব্যবহারিক ও মনোময় জগতের দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে ব্যাকুল, তখন এই ব্যবহার-তুষ্ট মন ছাড়া তাঁর পক্ষে অন্য একটি অ-ব্যবহারিক এবং অসম্পর্কিত মনের চর্চ্চা করা স্বাভাবিক। এই প্রকার মন (লোকে এই মনকে আত্মা বলে, শুনেছি ও পড়েছি) হয়ত ব্রহ্মজ্ঞানীর আছে, কিন্তু আর্টিষ্টের আছে নিশ্চয় জানি—কেননা দেখেছি। যাঁদের এই প্রকার মন আছে তাঁরা কল্পনা, অনুমানের এবং অনুমোদনের বাইরেকার সত্যের আভাস পেয়েছেন। তাঁরা মিথ্যার ধার ধারেন না, আদর্শবাদ ও বস্তুতন্ত্রবাদ তাঁদের কাছে মিথ্যাবাদের কাব্য ও গদ্য-সংস্করণ মাত্র। শরৎবাবুর লেখা অনেক হিন্দু ও ব্রাহ্ম রুচিবাগীশ পছন্দ করেন না—কেননা তাঁর লেখায় বাস্তবের পূতিগন্ধ বর্ত্তমান, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে, হিন্দু-সমাজের উত্তমাঙ্গ অর্থাৎ ব্রাহ্ম-সমাজ যে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণের মধ্যে স্ত্রীজাতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রচার-কার্য্যে ব্যগ্র, সেই উচ্চআদর্শের মধ্যে যথার্থ সত্যটুকু শরৎবাবুর প্রতি নভেলে, প্রতি পতিতা-রমণীর বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। 'ঘরে ঘরে, পথে ঘাটে মা বোন' যিনি দেখেন, তাঁর আদর্শহীনতা সম্বন্ধে কোন শুচিবাইগ্রস্ত পুরুষ কি রমণীই সন্দিহান হতে পারেন না। রবিবাবুর মতন বস্তুতান্ত্রিকও দুর্লভ —'ঘরে বাইরে'র মেজে জায়ের মতন, 'যোগাযোগে'

ভাড়ার ঘরের মতন নিখুঁত ও প্রকৃত ছবি কেউ এঁকেছেন কিনা জানি না, প্রেমের নীচতা এবং নিষ্ফলতা সন্দীপ ও বিনোদিনী অপেক্ষা আমাদের সাহিত্যের অন্য কোন চরিত্রে অত পরিস্ফুট হয়েছে কিনা জানি না। তাঁর পোষ্ট মাষ্টার ও বোষ্টুমীর চিত্র নব্যতন্ত্রের সাহিত্যিকে আঁকতে পারলে নিজেরাই যে ধন্য হতেন সে বুদ্ধি হয়ত তাঁদের নিজেদেরই আছে। শরৎচন্দ্র পতিতাও এঁকেছেন, অন্য চরিত্রও এঁকেছেন, রবিবাবু বড় ঘরের কথাও লিখেছেন আবার অন্য চরিত্রও এঁকেছেন। দুজনেরই সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, দূরদৃষ্টি আছে—কারণ তাঁদের দৃষ্টিশক্তি আছে, আর যা যথার্থ-সত্য দেখেছেন, ভেবেছেন, বুঝেছেন, সবই চমৎকারভাবে প্রকাশ কোরতে পেরেছেন। তাঁদের মন ও বুদ্ধি আত্মার দ্বারা গ্রথিত ও মার্জ্জিত, তাঁরা সম্পূর্ণ ও integrated, তাই তাঁদের সব অভিজ্ঞতাই সত্য—এমন কি খুঁটিনাটি-টি পর্য্যন্ত, অজানার আভাসটি পর্য্যন্ত। তাঁরা আর্টিষ্ট, অর্থাৎ যথার্থ-সত্যের সন্ধানী। অন্যেরা বুদ্ধিমান, আত্ম-ও সত্য-সন্ধানী নন্। এঁদের কারবার খণ্ড সত্য, কল্পিত সত্য, আনুমানিক সত্য নিয়ে। জোর এঁরা বৈজ্ঞানিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মতন আর্টিষ্ট অভিজ্ঞতাকে বিচ্ছিন্ন কোরে, টুকরো কোরে ব্যবসা চালান না। আর্টিষ্টের কাজ তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের দ্বারা অর্জ্জিত সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে। তাঁদের এক পা স্বর্গে, অন্য পা মর্ত্ত্যে। এক পদ মর্ত্ত্যে রাখলে সাধারণ মানুষের অন্য পদটিকেও মর্ত্ত্যে রাখতে হয়, কিন্তু যাঁরা নটরাজের নৃত্যের তালে তালে ছন্দ রাখতে পারেন, তাঁদের পক্ষে এ প্রকার অদ্ভুত ভঙ্গিমা অসম্ভব নয়। আর্টিষ্ট সাধার

মানুষও নন, বৈজ্ঞানিকও নন, সেইজন্য আদর্শবাদ ও বস্তুতন্ত্রবাদের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব হোমিওপ্যাথী ও এলোপ্যাথী সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোভাবেরই মতন।

১৩৩৪ অগ্রহায়ণ

সমাজধর্ম্ম ও সাহিত্য

ধর্ম্ম বোলতে সাধারণত শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বুঝি। যে পরিমাণে প্রত্যেক নর-নারীর বিকাশ, তার শ্রেণীর কিংবা সমাজের অবস্থা ও অভিব্যক্তি এবং সমাজ-নায়কদের আদর্শের ওপর নির্ভর করে সেই পরিমাণে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে বাধ্য। ব্যক্তিগত ধর্ম্মই সামাজিক ধর্ম্মের প্রেরণা। ব্যক্তিগত ধর্ম্মের অর্থ যতটুকু ধারণ করবার শক্তি, ততটুকু ধর্ম্মই সহজাত। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্ম মানে শুধু ধারণ করবার শক্তি নয়, সৃষ্টি করবারও শক্তি। সর্ব্বক্ষেত্রেই, অবস্থার বিপর্য্যয়ে পুনর্গঠনের শক্তিই ধর্ম্মের প্রাণ। সামাজিক ধর্ম্ম যখন রক্ষণ ও ধারণ কোরে ক্ষান্ত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সে সমাজে মানুষের মতন মানুষের দুর্ভিক্ষ হয়েছে, সে সমাজে আছে শুধু কঙ্কাল। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম যখন কেবল পুরাতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা ছাড়া অন্য কাজ পায় না, তখন বুঝতে হবে যে, সে ধর্ম্ম বহুদিন পূর্ব্বে মারা গিয়েছে। সৃষ্টির অর্থে জীবজগতের সৃষ্টি যতদূর হোক্ আর না হোক্, রূপ-জগতের, মানসিক জগতের, ব্যবহারিক জগতের এবং আনুষ্ঠানিক সৃষ্টিই বুঝতে হবে। সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে মুক্ত ব্যক্তি সমাজ সেই মুক্তিযজ্ঞের মাল-মশলা জোগান দেয় মাত্র। বাংলা দেশের বর্ত্তমান সমাজ এই জোগান দিতে পরাঙ্মুখ হয়েছে বোলে সকলেরই মনে হচ্ছে স্নেহান্ধ পিতামাতা যেমন সন্তানের অর্ব্বাচীনতা বয়সের

ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা দোষমুক্ত এবং দায়িত্বশূন্য হন, তেমনি অনেকে পূর্ব্বোক্ত পরাঙ্মুখীনতাকে যুগধর্ম্মের স্বভাব বোলে বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন দেখেছি। কিন্তু অক্ষমতাকে যুগধর্ম্ম বোলে যাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তাঁরা এই কথাটির মধ্যে ধর্ম্মের যথার্থ মানে না বুঝে, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে, যুগেরই উপাসনা করেন। যে কোন দু'টি মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটছে সেই কালই সেই পরিবর্ত্তনের সম্পর্কে যুগ। কালও পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিহিত রয়েছে—কালাতীত পরিবর্ত্তন হোতে পারে না। দুটি ক্ষণস্থায়ীর মধ্যে একটি বুঝতে হলে, সুবিধার জন্য, হয় একটি স্থির ভাবতে হবে, না হয় তৃতীয় একটি স্থিরসত্তা ভাবতে হয়। যুগ অনবরত সরে যাচ্ছে, ধর্ম্মও অনবরত বদলাচ্ছে—ঐ ক্ষেত্রে যুগধর্ম্ম মানে জার্ম্মান অধ্যাপকের আবিষ্কৃত Zeit Geist-এর তর্জ্জমা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কালের, যুগের এমন কোন সত্ত্ব, কিংবা গুণ, কিংবা প্রাধান্য থাকতে পারে না, যার জন্য ধর্ম্মের সত্তা, গুণ কিংবা প্রাধান্য লোপ পাবে। এ বৎসরের পঞ্জিকায় যে ১৯০০ সাল লেখা নেই,—১৯২৮ সাল লেখা আছে, এই তথ্যটি পরিবর্ত্তন-ক্রিয়ার কর্ত্তা নয়। তবে কর্ত্তা কে? সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, কর্ত্তা হচ্ছে সমাজ কিংবা শ্রেণী, অর্থাৎ ব্যষ্টির সমবেত শক্তি। কিন্তু যাঁরা মানব-মনের অনুকরণেচ্ছা লক্ষ্য কোরেছেন তাঁরা বোধ হয় অ-সাধারণ ব্যক্তিকে কর্ত্তা বোলতে দ্বিধা বোধ কোরবেন না। যাঁরা অসাধারণত্বে অবিশ্বাসী, তাঁরাও ভেবে দেখেছেন যে ব্যক্তিই হচ্ছেন কর্ত্তা; যদিও

কর্ত্তৃত্ব করবার সুযোগ ঠিক্ করে ঐ সমাজ, এবং আজকালকার যুগে ঐ শ্রেণী।

সে যাই হোক্, আর্থিক কিংবা পারমার্থিক কারণে সমাজ না হয় বদলে গেল। কিন্তু স্রষ্টা এবং অ-সাধারণ ব্যক্তি জন্মায় কি কোরে? সুপ্রজনন-বিদ্যার সাহায্যে অসাধারণত্বের খানিকটা প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সমাজ এখানেও বাধা দিচ্ছে। যে সমাজে শিক্ষিত যুবকের দল পর্য্যন্ত জন্মরোধের সুফল সম্বন্ধে সন্দিহান, যেখানে জীবনের বিবাহাদি প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক এবং প্রেতমূর্ত্তি পিতামাতা এবং পত্নীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে সুপ্রজনন-বিদ্যার বিস্তৃত প্রয়োগ আপাতত অসম্ভব। অবশ্য এই বিদ্যাটি রসায়নশাস্ত্র কিংবা পদার্থবিজ্ঞানের মতন এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি যে, তার সিদ্ধান্তের সাহায্যে কোন ভবিষ্যৎ-বাণী করা যায়। তবুও মানুষের নির্ব্বাচন-শক্তির দ্বারা অনুপযুক্ত লোকের জন্মরোধ, আর্থিক দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ এবং উপযুক্ত লোকের মৃত্যু-হার কমান সম্ভব, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। যে দেশে উপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেশি, সেখানে এই হলেই যথেষ্ট। আমাদের দেশে দুঃখ থেকে নিস্তার পেলেই চলবে না, সুখের রীতিমত ব্যবস্থা কোরতে হবে। তবে উপযুক্ত ব্যক্তি কে—কি রকম বিবাহে কোন্ ধরণের উপযুক্ত ব্যক্তি জন্মাবেন—আগে থেকে ঠিক করা অসম্ভব। কেননা, যেমন সুপ্রজনন-বিদ্যাটি অপরিণত, তেমনি বিদ্যার্থীর মনে উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন মতের ঐক্য

নেই—ফলে সুপ্রজনন-বিদ্যা, হিন্দুশাস্ত্রের মতন উদার হয়ে উঠেছে। যে বিদ্যায় যে কোন পূর্ব্বতন সংস্কারের নজীর পাওয়া যায়, সে বিদ্যা অল্প জানলেই নিজের মতকে দৃঢ়তর করা যায়। বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে উপযোগিতা সম্বন্ধে অনৈক্যের অন্যতম কারণ—প্রেমের প্রতি অন্ধবিশ্বাস। জাতিবিচার নিরর্থক হবার পরেই যৌন-বিচারের অন্য পদ্ধতি আবিষ্কার করা দরকার হলো। বাংলা দেশে প্রেম নামক পদ্ধতিটি আবিষ্কার কোরলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কর্ত্তাদের বারণ কেউ মান্‌ল না। তার পর এলেন রবিবাবু। তিনিই আমাদের সকলকে প্রেমে পড়তে শিখিয়েছেন। তাঁরই ভাষা দিয়ে আমরা প্রেম করি, তাঁরই ভাব দিয়ে আমরা প্রেমে পড়ি—গুরুজন ও গুরুদাসবাবুর বাধা সত্ত্বেও। প্রেম আমাদের ধাতে এসে গিয়েছে। ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের প্রকোপে অন্য কিছু হতেই পারত না। সে যাই হোক্, প্রেম কোরে বিবাহের মধ্যে এমন একটি দৈহিক ও মানসিক মাদকতা এবং অন্তত কয়েক মাসের জন্যও যৌন-সম্বন্ধের এমন একটি সম্পূর্ণতা আছে যার ফলে পুত্রকন্যারা ঢের বেশি স্বাধীনতাপ্রিয় ও নির্ভীক্ হয়ে ওঠে। যাঁরা বর্ত্তমান হিন্দু-বিবাহের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা খুঁজে পান, এবং হিন্দু-বিবাহে আধ্যাত্মিকতা ছাড়া অন্য কিছু নেই, এবং থাকা উচিত নয় মনে করেন, তাঁদের অবশ্য প্রেমে আস্থা নেই। যে আধ্যাত্মিকতা খুঁজে বার কোরতে হয়, তার চেয়ে দৈহিক ও মানসিক মাদকতা জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়

মনে করা স্বাভাবিক। প্রেমে পড়ে বিবাহ, এ ক্ষেত্রে মন্দের ভাল মানতেই হবে। এ গেল সুপ্রজনন-বিদ্যার উপকারিতা সম্বন্ধে ইংরাজী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত যুবকদের ধারণা। অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অন্যধরণে শিক্ষিত ব্যক্তির মনে সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার ধারণা থাকলেও, একটি গড়পড়তা মত পাওয়া যায়। উপযুক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য থাকবে, সাধারণ বুদ্ধি থাকবে, টাকা রোজগারের ক্ষমতা থাকবে, এবং সে ব্যক্তি অন্তত প্রকাশ্যে সামাজিক প্রথা মেনে চলবে। স্বাস্থ্য, অর্থ ও বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানের জন্যও সুপ্রজনন-বিদ্যার প্রয়োগ প্রয়োজনীয়, কিন্তু সুবোধ, সুশীল সন্তানদের জন্য সে প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। যে বিবাহের ফলে সুবোধ, সুশীল বালক-বালিকা জন্মগ্রহণ করে, সে বিবাহের নামই বিংশ শতাব্দীর 'হিন্দু-বিবাহ'। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে লোক যে দেহে ও মনে এত ভীরু তার একটি কারণ এই যে, দেশের পিতামাতার বিবাহিত জীবনে কোন প্রকার স্বাধীনতা ও স্ফূর্ত্তির ছাপ নেই, বরঞ্চ এমন একটি সঙ্কোচ আছে যার আওতায় দেহ ও মন ফুটে উঠতে পারে না। ভবিষ্যতে যুবক-যুবতীর মন থেকে ভীরুতা দূর করবার এবং তাদের সাহসী করবার একমাত্র উপায় যৌন-নির্ব্বাচন। যতদিন সে উপায়টি অবলম্বিত না হচ্ছে ততদিন প্রেমে পড়ে, বিবাহকেই বরণ কোরে নিতে হবে।

অ-সাধারণ ব্যক্তির জন্মগ্রহণের সুযোগ দেওয়া ভিন্নও সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার দ্বারা সমাজের সাধারণ স্তরকে উন্নত করা যায় অনেকে বিশ্বাস করেন।

এই উপায়ের বিপক্ষে অনেক আপত্তি আছে। প্রথমতঃ, উপায়টিই উপায়ের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, সুপ্রজনন-বিদ্যায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির খুব বেশি উন্নতি করা যায় বিশ্বাস করেন না। এ কথা সত্য যে, সাধারণের মধ্যে বুদ্ধির এবং জ্ঞানার্জ্জনের ক্ষমতার বিভাগ এবং বিস্তার সহজাতশক্তির ওপর যতটা নির্ভর করে, শিক্ষার তারতম্য এবং বিস্তারের ওপর ততটা করে না। শিক্ষিত হবার ক্ষমতাও যৌন-নির্ব্বাচনের দ্বারা বাড়ান যায়। তৃতীয়তঃ, সুপ্রজনন-বিদ্যা সম্বন্ধে যেমন মতের অনৈক্য আছে, শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি বৈ কম অনৈক্য নেই। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা সমাজের বড় বেশি উন্নতি করা যায় না। অবশ্য, এগুলি ঠিক আপত্তি নয়, বিপত্তি। অতএব ধীরে ধীরে বিপত্তিগুলি দূর হবে আশা করা যেতে পারে। যে কোন ভাল কাজেই বাধা-বিঘ্ন আছে—যে কোন সত্যেরই অন্তরায় আছে—সে অন্তরায় দেখাতে পারলেই সত্যকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে অন্তরায় হচ্ছে সাধারণের অশিক্ষা। অতএব সুপ্রজনন-বিদ্যার কথা মনে রেখে শিক্ষাবিস্তার কোরতে হবে। সেইজন্য বাংলাদেশে একটি মানসিক ভূগোল তৈরি কোরতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় একা এ কাজ হাতে নিতে পারে না—রাজারও ইচ্ছা নেই, কল্পনা নেই। অতএব বিবাহিত জীবনকেই সংস্কৃত কোরতে হবে। বিবাহিত জীবনই সামাজিক জীবনের মেরুদণ্ড, সেটিকে সোজা রাখতে হবে। উপায়—প্রেম ও সুপ্রজনন-বিদ্যার সাহায্যে যৌন-নির্ব্বাচনের সামঞ্জস্য

রক্ষা করা। এক কথায়, উপায়—জীবনকে, জীবনের প্রধান প্রধান অধ্যায়কে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত করা। আমার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান মাসিক-পত্রের পাতায় পাতায় পরোক্ষে বিবাহ ও যৌন-সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু খোলাখুলি অথচ ভদ্রভাবে কেউ এ সম্বন্ধে লেখেন না। আমার বিশ্বাস আর্টিষ্ট এই নিয়ে গল্পও লিখতে পারেন। কিন্তু সকলেই প্রেম নিয়ে ব্যস্ত। নব্য-সাহিত্যিকরা মনে করেন, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-নাথের যুগ চলে গিয়েছে—যদি গিয়েই থাকে তাহলে তাঁদের আবিষ্কৃত প্রেমও মাসিক-সাহিত্যের পাতা থেকে চলে যাক্ না কেন? সামাজিক ধর্ম্ম বদলাচ্ছে, ব্যক্তি বলছে যে, সে শুধু ধর্ম্ম রক্ষা কোরে ক্ষান্ত হতে পারছে না। সে এমন একটি ধর্ম্ম গড়তে চায় যার সাহায্যে তার শক্তির স্ফুরণ হবে—তার ক্ষমতাগুলি শতদলের মতন বিকশিত হবে। আপাতত, ব্যক্তি কাঁটা হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তির সঙ্গে পুরাতন সংস্কারের গরমিল হচ্ছে। সমাজ পেছিয়ে পড়ছে, ব্যক্তির অভাব পূরণ কোরতে পারছে না। ব্যক্তিও জোর গলায় বলছে না যে, সে বড় একটা কিছু কোরতে চায়। তার আকাঙ্ক্ষা ছোট। এ সময় মানুষ যা চাচ্ছে তার মধ্যে বীরত্ব নেই, সমাজ যে ভাবে বদলাচ্ছে তার মধ্যে ব্যক্তির প্রবল ইচ্ছা নেই, তার পিছনে বুদ্ধির চালনা নেই, তার সামনে কোন বিজ্ঞানসম্মত আদর্শ নেই। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের লেন-দেনের মধ্যে মানুষের চাওয়া কম—এর মধ্যে অনেকখানি ইচ্ছাশক্তির অতিরিক্ত, অর্থগত ও বিদেশীভাবগত অসামঞ্জস্যের

প্রেরণা রয়েছে। যা পরিবর্ত্তন হচ্ছে সবই আমাদের অনিচ্ছায়—এ পরিবর্ত্তন ভগবানের লীলার মতন বীর্য্যহীন। যা কিছু কোরতে হবে—সব যেন চোখ খুলে করি, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে করি, নিজের শক্তি খাটিয়ে করি। Social force-এ বিশ্বাস করাও যা, বাইরের ভগবানে বিশ্বাস করাও তা—সবই আত্মপ্রবঞ্চনা।

এক বছর পরে দেশে ফিরে তিনটি ঘটনা আমার চোখে পড়েছে। একটি সাহিত্যিক ঝগড়া, দ্বিতীয়টি কলকারখানায় ধর্ম্মঘট, এবং তৃতীয়টি যুবক-সম্প্রদায়ের জাগরণ। প্রত্যেক ঘটনার পিছনে আছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ। প্রথমটির সম্বন্ধে এত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে যে, সে বিষয়ে কোন নতুন কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটা অতি পুরাতন কথা না বোলে থাকা যায় না। নবীন সাহিত্য, অতি-আধুনিক সাহিত্য বোলতে আমি 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি'র ভাল লেখাকে যেমন ধরি, তেমনি ধরি 'শনিবারের চিঠি'র ভাল ব্যঙ্গ-রচনাগুলিকেও। দুই দলের লেখাতেই স্বাতন্ত্র্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। রস জিনিষটি দেশ ও কালের অতিরিক্ত হলেও যে বস্তুর, যে রূপের, যে আধারের সাহায্যে সেটি তৈরি হয়, সে বিষয়-বস্তু, সে রূপ ও সে আধার সাধারণত দেশ ও কালের অন্তর্ভূত সমাজসংক্রান্ত চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রতিক্রিয়াও এক ধরণের যোগ। শুধু প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অবশ্য সাহিত্য হয় না, কিন্তু সব প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র বৈপরীত্যের বিকার নয়। বৈপরীত্যের পিছনে নতুন ভাবের তাড়না থাকতে বাধ্য—

যেমন মাইকেলী যুগে ছিল। অতি-আধুনিক সাহিত্য আমাকে রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী, মাইকেলের জীবন-কথা, এবং নিমচাঁদের চরিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। ভূত যখন ছাড়ে, তখন ছাড়ার চিহ্নস্বরূপ গাছের ডালপালা ভেঙ্গে দিয়ে যায়। অত্যন্ত প্রপীড়িত হয়ে মানুষ যখন শাসনের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে, যখন সে বিদ্রোহ দমন কোরতে শাসনকর্ত্তা শাস্ত্র আওড়ান এবং শস্ত্র ধরেন, তখন সে বিদ্রোহের মধ্যে, সে শাস্ত্র ও অস্ত্রক্ষেপের মধ্যে সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, সুবিচার, সুরুচি থাকে না—কারণ এক দৈহিক পীড়ন ছাড়া অন্য কোন পীড়ন সামাজিক পীড়নের মত নিষ্ঠুর, নিবিড় ও ব্যাপক নয়। কিন্তু মানুষ বিরক্ত হয়ে মহাপুরুষদের মতন সংসার ত্যাগ কোরতে পারে না—সে যখন সমাজের মধ্যে থাকতে বাধ্য তখন তার বুদ্ধিবৃত্তিও অসামাজিক হতে বাধ্য। সেইজন্য মানুষের সঙ্গে তারই রচিত সমাজের মনকষাকষি চিরকালই চলছে—নিজের রচনার সঙ্গে বিবাদ করা বোধ হয় মানুষের ধর্ম্ম। যে কর্ম্মী, সে এই অসামঞ্জস্য-জনিত শক্তিকে সংস্কারের কাজে লাগায়, সেই নবযুগের পুরুষ। যে সাহিত্যিক কোন মতামত প্রচার না কোরেও গোটা মানুষের সঙ্গে বাহিরের সমাজ ও অন্তরের প্রকৃতির নতুনপ্রকার বিরোধকে রূপ দিতে পারে সেই নব্য-সাহিত্যিক। এই রূপ সামাজিক হবে না, অ-পরিচিত হবে জনসাধারণের কাছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিরোধের সঙ্গে পরিচিত সে এই নতুনত্বের খাতির করবে। সাহিত্যের সঙ্গে যুগধর্ম্মের ও সমাজের সম্বন্ধ এই বিরোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য, যতদিন সাহিত্যের

বিষয় মানুষ থাকবে এবং যতদিন সাহিত্যিক বুঝতে কল বুঝব না, মানুষ বুঝব।* সমাজতত্ত্ববিদ্ অবশ্য রূপ সৃষ্টি করে না, কিন্তু সেও মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পায়, সেও সামাজিক অত্যাচার লক্ষ্য করে, এবং অত্যাচার উপশম করবার জন্য জ্ঞানত অসামাজিক মতামত পোষণ ও প্রচার কোরতে বাধ্য হয়—এই হতে বাধ্য, যতদিন সমাজতত্ত্বের বিষয় প্রথমে মানুষ, পরে মানুষের অনুষ্ঠান থাকবে—যতদিন সমাজতত্ত্ব লিখতে মানুষের দরকার হবে। বিজ্ঞানসম্মত সমাজতত্ত্বেও সামাজিক অত্যাচার নিরাকরণের অধ্যায় বাদ পড়বে

* ১৬ই মে তারিখের আমেরিকান 'নেশন' পত্রিকায় দুটি উপাদেয় প্রবন্ধ পড়লুম। একটির বিষয় বর্ত্তমান ফরাসী সাহিত্যের ধারা, অন্যটির বর্ত্তমান রুষ-সাহিত্য। লেখকদ্বয় নামজাদা সমালোচক Rene Lalou লিখছেন—"The most striking feature in every field of French literature at the present moment seems to be a general disinclination to treat art for art's sake; our writers deliberately use it as an instrument for the probing of social or psychological problems"—লেখক বিস্তর দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখছেন—"...in our time *the true traitor is the artist who does not take sides.* Even in psychology, neutrality seems impossible...From that point of view literature may be said to play its part in the national effort to build up France again." Louis Fischer ঐ সংখ্যায় রুষ-সাহিত্য সম্বন্ধে একই কথা লিখছেন—"To the Soviet critic an author's social philosophy is the first criterion...The only decisive difference between seven or seventeen literary armies is their realism or futurism"—মন্তব্যগুলি ফরাসী কি রুষ-সাহিত্য সম্বন্ধে সত্য কি মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা নেই। বিদেশে যা হচ্ছে এদেশে তাই হওয়া উচিত তাও বলছি না। তবে সামাজিক পরিবর্ত্তনকে অর্থাৎ বিরোধকে সাহিত্যিক সাহিত্যের বস্তুহিসাবে গ্রহণ কোরতে বাধ্য, এই আমার ধারণা।

না। অতএব যদি সমাজের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়ে থাকে, যদি সমাজ-শাসনের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে থাকে, এবং সে প্রতিক্রিয়ার যদি কিছু মূল্য থাকে; যদি লোকে বুঝতে পেরে থাকে যে, বড় আদর্শ, পুণ্য, ধর্ম্ম, পবিত্রতার নামে সেই পুরাতন ব্রাহ্মণের বংশধর, সমাজরক্ষকের দল পৈতা ফেলে, plain dress constable সেজে agent provocateur-এর কাজই করছে, তাহলে সে বিদ্রোহের, সে প্রতিক্রিয়ার সুফল, কুফল মাসিক-সাহিত্যের পাতায়, সমাজতত্ত্বের পাতায় ধরা পড়বে। অবশ্য যদি এই সব সত্য হয়, তবেই ধরা পড়বে, নচেৎ নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। নব্য মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, complex ভাঙ্গবার একমাত্র উপায় সাহসভরে তাকে বোঝা, তাকে প্রকাশ করা। সেইজন্য মনে হয় যদি কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি ও শনিবারের চিঠির লেখকবৃন্দের মধ্যে যে কেউ প্রতি মাসে বর্ত্তমান সমাজের বিপক্ষে যুবক-সম্প্রদায়ের আপত্তিগুলি দাখিল করেন, তাহলে নিছক সাহিত্যসৃষ্টি না হলেও যুবক-সম্প্রদায়ের জাগরণ সত্যকারের জাগরণ হয়, যুবকদের মনে প্রতিক্রিয়ার অসার বৈপরীত্যবোধ লোপ পেয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয়, এবং তাঁরা নিজেদের ধর্ম্ম খুঁজে পেয়ে সংযত হ'ন। সংযমী হবার এই একটি উপায় আছে। দেশে জনকয়েক Calvins of East Bengal-এর দরকার হয়েছে—ব্রাহ্মধর্ম্মের কাজ এখনও ফুরোয়নি। নতুন সাহিত্য গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সমাজের দোষত্রুটি লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার সময় এসেছে।

নব্য-সাহিত্যের অতিরঞ্জনের জন্য সমাজকেই দায়ী করি। মানুষের দোষ বেশি দেখতে পাই না, যদি তার দোষ থাকে সেটি এই যে, সে এতদিন সমাজের দোষগুলি বুঝতে পারেনি।

নব্য-সাহিত্যে এই অতিরঞ্জনের মধ্যে বিদ্রোহ এবং প্রতিক্রিয়ার অংশটুকু বাদ দিলে অন্য কোন সাহিত্যগুণ আছে কিনা সে বিষয় আলোচনা আমি করছি না। রসবোধ রুচিসাপেক্ষ। রুচি শুধু স্বাভাবিক বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, শুধু বিচার-বুদ্ধির দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না, শিক্ষার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না—শুধু conditioned reflex বা learned reaction দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা যায় না—রুচি নিউটনেরও তোয়াক্কা রাখে না, ওয়াট্‌সনেরও খাতির রাখে না। রুচি অভ্যাস নয়, স্মৃতিও নয়। রুচি ব্যক্তির একটি সম্পূর্ণ অনুভূতির প্রতিবিম্ব। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ হয়নি, তার অনুভূতি একদেশদর্শী, তার অনুভূতি প্রবৃত্তির নামান্তর—অতএব তার রুচির কোন বিশেষ মূল্য নেই—অন্তত রসের ক্ষেত্রে। ব্যক্তিত্ববিকাশের স্তরের জন্য রুচিগত পার্থক্য হয়। রুচির অভিব্যক্তি আছে, ইতিহাস আছে, অতএব ভিন্নস্তরের রুচির সঙ্গে মিল সম্ভব নয়। সেইজন্য রুচির কথা ছেড়ে দিচ্ছি। পূর্ব্বেই বোলেছি যে বোঝবার সুবিধার জন্য সাহিত্যের বক্তব্য এবং বিষয়-বস্তুকে রস থেকে পৃথক কোরতে হয়। বক্তব্য বিষয়ে অতি-আধুনিক সাহিত্যিক সচেতন কিনা, রূপে কতখানি মতামতের খাদ থাকা উচিত, কিংবা কতখানি খাদ থাকলে অলঙ্কার তৈরি হতে পারে,

একই বিষয়-বস্তুর একই রূপ হওয়া উচিত কিনা, আমি জানি না। আমি জানি এইটুকু—যদি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের মনোমালিন্য হয়ে থাকে, যদি এই মানসিক ঘর্ষণের ফলে ব্যক্তির মধ্যে কোন নবশক্তির উদ্রেক হয়ে থাকে, তবে সে শক্তিকে মাত্র একটি রূপে পর্য্যবসিত কোরলে সে শক্তিকে অপমান করা হয়।

একটি রূপ বোলতে একধারে যৌন-সম্বন্ধমূলক সাহিত্য এবং অন্যধারে সেই সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ার ব্যঙ্গরচনাকেই নির্দ্দেশ করছি। যৌন-সম্বন্ধ মানুষের খুব বড় সম্বন্ধ, পুরুষ স্ত্রীজাতির ওপর অত্যাচার করে এই সম্বন্ধ নিয়ে, যৌন-সম্পর্কেই অত লুকোচুরি, অত জুয়াচুরি ; এবং সে অত্যাচার, সে জুয়াচুরি যত শীঘ্র সমাজ থেকে যায় ততই মঙ্গল। ব্যঙ্গরচনাও উচ্চ সাহিত্যের একটি অঙ্গ। 'পরশুরাম' বাংলা সাহিত্যে অমর থাকবেন—সতীশ ঘটকের 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' সকলেরই প্রিয়। কিন্তু হিন্দু-বিবাহের বাধাবিপত্তির বিপক্ষে বিদ্রোহটাই যেমন রচনা-শক্তি নয়, তেমনি বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এমন শক্তি নেই যেটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে। যৌন-সম্বন্ধ মানুষের সম্বন্ধ, ব্যঙ্গ-শক্তি মানুষেরই শক্তি। মানুষকে ভুলে গিয়ে তার বিশেষ কোন শক্তি এবং সম্বন্ধ বিচার করা বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুবিধার কথা হলেও রসানুভূতির পথ নয়। যেখানে ব্যথা, যেটি সহজগম্য নয়, সেইখানেই চোখ পড়া স্বাভাবিক—অতএব সাহিত্যের বিষয়-বস্তু অবৈধ অর্থাৎ অসামাজিক প্রেম হতে বাধ্য। প্রেমে পড়া—কি বৈধ কি অবৈধ প্রেমে পড়া—মানুষের সব চেয়ে exacting

profession হলেও সাধারণত এমন প্রেম ত' দেখিনি যার জন্য মানুষের সব চিরকালের জন্য বদলে গেল। আর যাদের সব বদলে যায় তাদের সাহিত্যসৃষ্টি করবার কোন স্থিরবুদ্ধি থাকে না। প্রেমে ভাটা পড়লে তবে পলি পড়ে এবং সেই পলিতেই আর্ট ও সাহিত্যের ভাল ফসল তৈরি হয়। রাগ থামলে তবে ব্যঙ্গরচনা সম্ভব হয়। সাহিত্য detumescent অবস্থার চিহ্ন। অবশ্য এ সব কথা রসস্রষ্টার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধেই খাটে—কিন্তু রাগ এবং অনুরাগের সব অবস্থাই সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হতে পারে না বলি কি কোরে! ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে রক্তের স্রোত বইত, দু'শ বছর পরে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবে রঙ্গমঞ্চে খুন-খারাপি বন্ধ হলো, আবার আজকাল সে দেশে এমন নাটকও লেখা হচ্ছে যার প্রথম দৃশ্যেই বন্দুক চলছে। রোদ্যাঁর বৃদ্ধা বেশ্যাকে দেখলে লেসিং লাওকুনের হাসি-মুখের অন্য ব্যাখ্যা কোরতেন নিশ্চয়। সব জিনিষই রসবস্তু হতে পারে, তবে রসোৎপাদনের জন্য সে বস্তুর কতটুকু প্রকাশ্য, কতটুকু বেছে নিতে হবে তার ভার রসস্রষ্টার হাতে। আমার বক্তব্য এই যে, কামবিষয়ে নিরর্থক এবং নিতান্ত অপকারী লজ্জাকে ভাঙ্গতে আমাদের সব শক্তি যেন নিয়োজিত না হয়—সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য complex-কেও ভাঙ্গতে হবে। আদৎ কথা, মনের ভয় ভাঙ্গা; কাম ছাড়া মনের অন্য জুজু নেই কি? আমার বিশ্বাস, সাহিত্য জুজু তাড়াবার ভার বেশ নিতে পারে। হয়ত সেটি মাসিক-সাহিত্য হবে, তা হোক্, এই মাসিক-সাহিত্যের চিরস্থায়ী হতে কোন বাধা নেই। অনেক

নজির দেখান যায় যে, মাসিক-সাহিত্য সনাতনত্বের কোঠায় উঠেছে। সমসাময়িক সভ্যতা গড়ে তোলা কি এক দলের কাজ, না একঘেয়ে কাজ, না শুধু সমাজ-সংস্কারকের একচেটে ব্যবসা? এ কাজ সাহিত্যিকের, বৈজ্ঞানিকের এবং ঐতিহাসিকের, পরে সমাজ-সংস্কারকদের, এককথায় এ কাজ প্রবুদ্ধ ব্যক্তির। আমি সব দলকে নিবেদন করছি, যেন তাঁরা ক্ষোভের বশে, দাম্ভিকতার বশে, রাগের বশে সভ্যতা তৈরি করার ভার অন্যের হাতে ন্যস্ত না করেন।

কথাটা অন্যভাবে বলা যাক্। বাস্তব-সাহিত্য বোলে যদি কোন সাহিত্য থাকে তাহলে সে সাহিত্যের methodology হবে বৈজ্ঞানিক এবং বিষয় হবে প্রকৃতি ও মানুষের অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাত। এই বচনটি বস্তুতন্ত্রবাদের গুরু জোলা লিখেছিলেন গত শতাব্দীতে, যখন বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের মোহে সকলেই আচ্ছন্ন। কিন্তু এখনও সে মোহ সকলে কাটিয়ে উঠতে না পারলেও অনেকেই বেশ বুঝেছেন যে, মোটামুটিভাবে বৈজ্ঞানিকের মনোভাবের সঙ্গে রূপকারের মনোভাবের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। মধ্যযুগের শিল্পী তাঁর সততা, নির্ব্বাচন-শক্তি এবং একনিষ্ঠতার সাহায্যে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের সমকক্ষ। অবশ্য সাধারণ লোকের, যাদের মন শিল্পীরও নয়, বৈজ্ঞানিকেরও নয়, অথচ শিল্প ও বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত, তাঁদের ধারণা এই যে, ঐতিহ্যের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে objective outlook-এর একটি আন্তরিক বিরোধ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ বিরোধ বিজ্ঞানের সঙ্গে আর্টের নয়, এ বিরোধ ঐতিহ্যবাদী আদর্শবাদীর সঙ্গে বিজ্ঞানবাদীর — রূপ ও রসসৃষ্টির

স্বাধীনতার সঙ্গে প্রভুসম্মত বাণীর। আমরা সাধারণ লোক, কিছুই সৃষ্টি কোরতে পারি না—কিছুই ভাঙ্গতে চাই না কিংবা ভাঙ্গবার সাহস আমাদের নেই—আমাদের বিজ্ঞান পড়া ইংরাজী, সংস্কৃত ও ইতিহাস না জানার দরুণই হয়। কিন্তু যাঁরা বস্তুতন্ত্রবাদী তাঁদের কাছেও বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং বর্ত্তমানের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রত্যাশা করা কি অসঙ্গত? শনি-মণ্ডল বস্তুতন্ত্রবাদী নন্, কিন্তু তাঁরাও বলেন যে, তাঁরা নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা কোরে থাকেন—কোন ব্যক্তিকে আঘাত করেন না, কেবল ধারা নিয়ে সমালোচনা করেন—অর্থাৎ ব্যবহারে তাঁরা বৈজ্ঞানিক এই প্রমাণ কোরতে চান্। কিন্তু তাঁদের কারুর মধ্যে scientific spirit আছে বোলে ত' মনে হয় না। কল্লোল-দল কাম ও ক্রাইম নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে লিখবেন, কেউ রাগতে পাবে না, শনি-মণ্ডল কোন বিশেষ ব্যক্তির অযথা ও অন্যায় সমালোচনা কোরবেন, তাঁর বন্ধুরা রাগতে পাবে না—এইটুকুই কি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সঙ্গে তাঁদের একমাত্র সম্বন্ধের চিহ্ন হবে? নব্য-সাহিত্যিক বাল্য-বিবাহের বিরোধী, প্রেমে স্বাধীনতা চান, বিবাহকে সংস্কার গণ্য করেন—কিন্তু হিন্দু-সমাজকে, হিন্দু-মনোভাবকে ভেঙ্গে চুরে দিতে হবে বোলতে ভয় পান কেন? আমি জানি দু'দলের কোন কোন মহারথীরা হিন্দু-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার কোরতে শতমুখ হ'ন—হিন্দু-সমাজ এতদিন বেঁচে এসেছে বোলেই শ্রেষ্ঠ সমাজ, কায়দায় পড়ে, না জেনে শুনে, অন্য সমাজকে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে আশ্রয় দিয়েছে বোলেই খুব উদার, হিন্দু-ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মকে সমন্বয় কোরবে, এইসব ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন, এবং

তাঁদের মস্তিষ্কটি হৃদয়ে অবস্থিত বোলেই হিন্দু-ধর্ম্ম নিয়ে অনেক ভাবপ্রবণ 'চিন্তাশীল' লেখা লেখেন; নব্য-সাহিত্যিকরা সব খদ্দর পরছেন—মনের কোণে বোধ হয় এই বিশ্বাস আছে যে, খদ্দর পরলে দেশ স্বাধীন হোক্ আর না হোক্ সাহেব জব্দ হবে। এঁরা কেউ কেউ দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় ব্যস্ত—অথচ সত্যকারের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের কাছে, গণতান্ত্রিক মনোভাবের কাছে, দরিদ্র-নারায়ণের যথার্থ সেবকবৃন্দ, অর্থাৎ সোশিয়ালিষ্টের কাছে না আছে দেশী, না আছে বিলেতী। সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রবাদ কি তাহলে অসাহিত্যিক মনের কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়? একটি নতুন ভঙ্গিমার বিস্তার মাত্র? এর মধ্যে সত্য কি কিছুই নেই? আধুনিক সাহিত্যিকরা শুধু Realism-এর ভক্ত—না সত্যকারের Realists? শনি-মণ্ডলের লেখা পড়লে মনে হয় যে, তাঁরা সব ব্রাহ্মণ-সভার পরিপোষক, গোপনে গোপনে বোধ হয় চাঁদাও দেন। বস্তুতন্ত্রবাদীরা না হয় অবৈজ্ঞানিক হলেন, কিন্তু তাঁদের হতে আপত্তি কি? তাঁরাও ত' নব্যভব্য—তাঁদের রস-রচনাও ত' বাংলা সাহিত্যে নতুন সম্পদ এনেছে? স্রেফ্ গালাগালি দেওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য কখনই হতে পারে না। উদ্দেশ্য, মাত্র এক সমসাময়িক সভ্যতার মূল্য নির্দ্ধারণ করাই হতে পারে, পুরাতন সভ্যতার মূল্য নতুন আদর্শে নতুন অবস্থার অনুপাতে নতুন কোরে যাচাই করা এবং পরবর্ত্তী সভ্যতা ভব্যতা ও বৈদগ্ধ্যের ভিত্তি গাঁথাই আদর্শ হতে পারে। কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি এবং শনিবারের চিঠি আমি পেলেই পড়ি এবং প্রায়ই পড়ি। কিন্তু কোথাও contemporary culture-এর সমালোচনা

পড়েছি বোলে মনে হয় না। শনি-মণ্ডলের সমালোচনা-শক্তি কল্লোল-দলের অপেক্ষা বেশি আছে অনেকে সন্দেহ করেন, তাঁরাই এ কাজটি করুন না? আমি 'শনি-মণ্ডল'কে কালো নীরে ঝাঁপ দিতে অনুরোধ করি। নিজেদের ছায়া দেখে ভয় কোরলে চলবে না। আমার সন্দেহ হয়েছে যে, শনি-মণ্ডল কল্লোল-সম্প্রদায়ের মতনই সমাজ ও জীবনের first and last things নিয়ে নাড়া চাড়া কোরতে ভয় পান, কিংবা সময় পান না, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধে যে শক্তি জন্মগ্রহণ কোরেছে তাকে খাটাতে ভয় পান কিংবা সময় পান না! আমাদের মতন কাপুরুষ বোধ হয় কুত্রাপি নেই—নচেৎ যাঁরা দেহ সম্বন্ধে এত খোলাখুলি লিখতে সাহস পান—যাঁরা যে কোন সাহিত্যিকের লেখা সমালোচনা কোরতে ব্যগ্র এবং জনমতের বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ কোরতে উদ্যত, তাঁরাও লজিকের শেষবেশ দেখতে নারাজ!

কার্ল মার্কসের শিষ্যেরা সমাজ অর্থে মূলত শ্রেণী বোঝেন। তাঁদের মতানুসারে সামাজিক ধর্ম্মের মানে শ্রেণীগত ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম বদলাচ্ছে; পূর্ব্বে, পরে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত ধর্ম্মও বদলাচ্ছে। যৌন-সম্পর্ক সমাজ-ধর্ম্মের একটি মূলকথা, সে সম্বন্ধে ধারণা বদলাচ্ছে (অনেকস্থলে সাহিত্যের সাহায্যে), বিষয়-বস্তুর নির্ব্বাচনে এই পরিবর্ত্তনের আভাস ভাল কোরেই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সমাজে অন্যান্য ঘটনাও ঘটছে—সেগুলির মূল্য আমরা দিতে শিখিনি। বিবাহ-পদ্ধতি বদলান যেমনভাবে দরকারী মনে করি, দেশের অন্যান্য অবস্থার পরিবর্ত্তনও তেমন

আগ্রহের সঙ্গে দরকারী মনে করি না। সেগুলি সাহিত্যের বিষয়-বস্তু বোলে গ্রাহ্য কোরছেন অনেকে, দু' এক জনের হাতে সেগুলির সাহায্যে রসসৃষ্টিও হয়েছে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলির প্রভাবে যে নতুন মানুষ তৈরি হচ্ছে সেই নতুন মানুষের স্থান সাহিত্য এখনও নিরূপণ করেনি। সাহিত্য সেগুলিকে tendency বোলে ছেড়ে দিয়েছে—সেই tendency-র ফলে সংস্কৃত ব্যক্তির আচরণ লিখতে অনেকেই ভয় পান। এই যে ধীরে ধীরে বাংলা দেশের লোকেরা গ্রাম ছেড়ে ছোট বড় সহরে বাস কোরছে, এই যে লোকেরা ব্যবসা সুরু কোরেছে, ধান ডাল যবের ক্ষেত না কোরে পাট এবং রপ্তানীর উপযোগী শস্যের চাষ আরম্ভ কোরেছে, এই যে টাকার আধিপত্য সুরু হয়েছে, যেখানে কল-কারখানা সেখানে মুটেমজুরের দর ঝুঁকে পড়েছে অথচ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর-কন্না কোরতে পারছে না, কিংবা যে ঘরে ঘরকন্না কোরছে সেটি বাসের উপযুক্ত মোটেই নয়, এই যে মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় সহরের মেসে বাস কোরছে, এর ফলে কি ধর্ম্ম, সমাজ এবং গোষ্ঠী ভেঙ্গে যাচ্ছে না—এবং সেই ভাঙ্গনের ফলে মানুষের আচরণ ব্যবহারগুলি কি বদলে যাচ্ছে না? মুটেমজুর, চাকরবাকর, বাড়ীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, চাষী ও গরীব কেরাণীর দল সকলেই অত্যাচারের বিপক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সঙ্ঘ বাঁধছে, ধর্ম্মঘট কোরছে, টাকা দিয়ে মানুষের মূল্য ঠিক্ কোরছে, এককথায় 'জড়বাদী' হয়ে উঠেছে। আগে লোকেরা কতখানি আধ্যাত্মিক ছিল জানি না, তবে ভগ্নী নিবেদিতার পর থেকে জনসাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বিরল

হয়ে উঠেছে দেখছি। তবে ভণ্ডামীও সেই অনুপাতে বাড়ছে বলা যেতে পারে। জড়বাদ ভাল কি মন্দ সে কথা উঠছে না এবং সাহিত্য জড়বাদের ব্যাখ্যা করুক তাও বলছি না। তবে জড়বাদ যে বর্ত্তমান যুগে নিতান্তই স্বাভাবিক, সে-কথা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি এবং সহুরে লোক কি কোরে অস্বীকার করে? যতক্ষণ অঙ্গ অসুস্থ থাকে ততক্ষণ মন অসুস্থ অঙ্গের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে—অবশ্য তুলনাটি ঠিক্ হলো না, কেননা ক্ষুধা অসুস্থতা নয়, সুস্থদেহেরই লক্ষণ। যাই হোক্, মানুষের মনোবৃত্তিগুলি এবং আচার ব্যবহার এমনিভাবে বদলাচ্ছে যে, সেগুলি সকলেরই নজরে পড়া উচিত। নজরে পড়লে অনেকে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ কোরে ফেলেন। মনের মধ্যে একধারে ঐতিহ্যরূপ চেড়ীর দল চাবুক নিয়ে শাসাচ্ছে, অন্য ধারে গালফুলো ভুঁড়িওয়ালা, গগন ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রের ভট্চায্যি মশাই-এর মতন আত্মপ্রসন্ন দেশাত্মবোধ সর্ব্বদাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আমরা সব আধ্যাত্মিক; ফলে মন কাজ বন্ধ কোরে দিয়েছে। বস্তুতন্ত্রবাদীদের সোশিয়ালিষ্ট্ হবার সাহস আছে কি? সামাজিক পরিবর্ত্তনের ফলে দেশের মতি গতি কোন্ ধারে যাচ্ছে তার খতিয়ান শনি-মণ্ডল কবে কোরবেন? সবই নারায়ণ কোরছেন বোলে আশ্বস্ত হলে চলবে না। বীর্য্যবান্ পুরুষ ভগবানের মুখ চেয়ে থাকে না। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি, প্রপীড়িত ব্যক্তি ধীরে ধীরে বুঝছে যে তার রচিত, কিংবা ধনীর, কিংবা ব্রাহ্মণের রচিত ভগবান্ স্বকল্পিত দুঃখের অবসান কোরতে পারেন, কিন্তু প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক দুঃখের অবসান করা সেই স্বকল্পিত ভগবানের

ক্ষমতার অতিরিক্ত। নাটকের ছয়টি চরিত্রের কোনটিও নাট্যকারের ক্ষুন্নিবৃত্তি কোরতে পারে না। দরিদ্রবৎসল, প্রপীড়িতবৎসল ভগবান্, হয় দরিদ্র ও পীড়িত মস্তিষ্কের, না হয় স্বার্থপর মস্তিষ্কের উদ্ভূত।

তরুণ দলের অনেকে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় রত হয়েছেন। দরিদ্র ব্যক্তির সেবকদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু দেশের আত্মার সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাই দরিদ্রের ভগবানকে খুঁজে বার কোরেছেন। যাঁরা নিজেদের আবিষ্কৃত দেশাত্মার উপাসনা কোরে ও পূজারী হয়ে অন্নের সংস্থান করেন, সাধারণত তাঁরাই সর্ব্বদেশে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায়েৎ হ'ন। এঁরা সকলেই প্রায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। এঁরা যখন মুখ খোলেন এবং সেই মুখ থেকে যখন অনুকম্পার দুধ ক্ষরণ হয়, তখন সেই দুধের সাধ হয় একটু ঘোলের মতন। যে কোন নামজাদা বিলেতী নভেলের পাতায় গরীবদের জীবনকাহিনী এবং বর্ত্তমান মাসিক-পত্রিকায় বর্ণিত মুটে-মজুর বেশ্যার জীবনকাহিনী পড়লেই বেশ বুঝা যায় তফাৎ শুধু আর্টের ক্ষেত্রে নয়, sincerity of feeling-এও। এ লেখায় মধ্যে মধ্যে এমন একটি patronising-এর সুর পাওয়া যায় যেটি সত্যকারের অভিজ্ঞ ব্যক্তির কলম থেকে আশা করা যায় না। এ ধরণের লেখা মন্দের ভাল। একধারে যেমন মজুরদের শিক্ষার অভাবে তুলসী গোঁসাই ও দেওয়ান চমনলাল নেতা হতে বাধ্য হয়েছেন, তেমনি বাধ্য হয়ে অধ্যাপকের দল ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মজুর-সাহিত্য লিখতে সুরু কোরেছেন। আর একটি কারণে এই ধরণের বর্ণনার মধ্যে ভুল সুর থাকে। যে পরিমাণে

যৌবন আদর্শবাদী, সেই পরিমাণে যৌবন দুঃখবাদী নয়। বুদ্ধদেব যাই থাকুন না কেন, বর্ত্তমান যুগে খুঁজে খুঁজে দুঃখ বার করা এবং সেই দুঃখের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাওয়া, নয় বিকারের চিহ্ন, না হয় এক ধরণের ভাববিলাস মাত্র। দুঃখ চোখের সামনে না এসে পড়লে, মনকে বিশেষ রকম ধাক্কা না দিলে, দুঃখকে তাড়াবার এবং উড়িয়ে দেবার চেষ্টা বিফল না হলে আর কেউ দুঃখকে গ্রহণ করে না। দুঃখকে বুঝে তাকে দূর করবার জন্য উপায় অবলম্বন করবার সঙ্গে যে সাম্য ও মৈত্রীভাব, আসে সেই ভাবই স্থির ও কার্য্যকরী, কিন্তু সে ভাব আনতে রীতিমত সময় লাগে। শিশুরা পর্য্যন্ত ভীষণ অর্থাভিমানী হয়। অনেক দেখে শুনে, অনেক পোড় খেয়ে, অনেক অভিজ্ঞতার পর, অনেক বিচারের ফলে মানুষ সত্যকারের জ্ঞানী হয়। সহানুভূতি স্থিরবুদ্ধির ফল, অর্ব্বাচীনতার ফল নয়। যৌবনে দরিদ্র-নারায়ণের পূজা করা সাহিত্যের রোমান্টিসিজ্‌ম্ ছাড়া সাধারণত অন্য কিছু নয়। শুধু তাই নয়, যেমন প্রেম শেষ হবার সময় সাহিত্য সম্ভব হয়, রাগ থামলে ব্যঙ্গরচনা সার্থক হয়, তেমনি পরের দুঃখে কান্না বন্ধ হলেই ব্যথার সাহিত্য সম্ভব হয়। আমার মনে হয় মুটেমজুর বেশ্যাকে দেখবা-মাত্রই যে কান্না আসে, সে কান্না চোখের দোষেই। সত্যকারের দরদ আনবার জন্য সহানুভূতি ছাড়া কার্ল মার্কসের বই পড়তে হয়, তাঁর মত এদেশে কতখানি খাটে ভেবে দেখতে হয়, এককথায় কিছু বুদ্ধি খরচ কোরতে হয়। দেখে শুনেও যদি দুঃখ ঘোচাবার প্রবৃত্তি থাকে তাহলে পুরোপুরি সোশিয়ালিষ্ট হতে হয়। কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে দেশ-প্রীতিও উড়ে যাবে জেনে রাখা ভাল। দরিদ্র-নারায়ণ দেশমাতার ভীষণ শত্রু। ছুটোর একটিকে ছাড়তেই হবে—না একটিকে রাখা চলে? মাসিক-পত্রিকা পড়ে মনে হয় যে, নব্য-সাহিত্যিকবৃন্দ ছুই-ই রাখতে চান। ভাবপ্রবণতার সরু গলিতে জুড়ী হাঁকান অসম্ভব।

সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সমাজ ও ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সূক্ষ্মপুরুষটি না বদলালেও তার মানসিক অভ্যাসগুলি বদলে যাচ্ছে। সেই পরিবর্ত্তনের বিবরণ চাই। সেই বিবরণই ভবিষ্যৎ সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হবে। তারপর অ-সাধারণ ব্যক্তির কথা—আর্টিষ্টের কাজ। সে সম্বন্ধে কিছু বোলতে চাই না।

সন ১৩৩৫

বিশ্ব-কবি

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্ব-কথাটি সর্ব্বদাই যুক্ত থাকে। কি অর্থে এই কথাটি প্রযোজ্য ভেবে দেখা উচিত। যাঁরা জ্ঞানী পাঠক তাঁরা দেখিয়ে দিতে পারেন কাব্যের কোন্ উপকরণ দেশ ও কালের অতীত, কোন্ পদ্ধতি সার্ব্বভৌমিক, কোন্ লিখন-ভঙ্গী অমর। সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, তার উপাদানের ও উপাদান-সংযোগের চিরন্তন মূল্য যাচাই করা সাধারণ পাঠকের শক্তিতে কুলায় না। সকলেই কিন্তু একটা কথা বোঝেন, কবি হতে গেলেই দেশ ও কালের ভেতরে থেকেও তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়, কবির কাছে তাঁর দেশ ও কাল উপায় মাত্র। এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের কাব্য-বস্তু ও কাব্যাবস্থান আমাদের সুপরিচিত না হলেও তাঁরা আমাদের নিতান্ত প্রিয়। তাঁদের পরিমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের আপেক্ষিক অজ্ঞানতা আমাদের রস-গ্রহণের মাত্রা হ্রাস করে মনে হয় না। কিন্তু অন্য একটা দিক্ থেকে আমাদের কাছে দেশ ও কালের একটা বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে অন্তত দেখার আনন্দ হয়, যাকে চিনি না তার কাছে সঙ্কোচ বোধ করি, তাকে আপন করতে সময় লাগে, অভ্যস্তকে আমরা সহজে গ্রহণ করি, অনভ্যস্তকে আমরা ভয় করি, পরিহার করি, নচেৎ অনিচ্ছায় গ্রহণ করি। আমাদের কাছে আমাদের দেশ ও কাল বন্ধুর মতনই পরিচিত। অবশ্য জ্ঞানের দ্বারা অপরিচিতও পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে জ্ঞানলাভের জন্য শক্তি খরচ করতে হয়, মনকে নিবিষ্ট করতে হয়। শক্তির এই

'অপ'-ব্যবহার, এই 'অপচয়' সহজ-আনন্দ-উপভোগে বিঘ্ন উৎপাদন করে। কারণ, অন্তত পরিমাণের দিক্ থেকে বলা যায় যে, কোন এক বিশেষ অবস্থার পক্ষে মানসিক শক্তি স্থির ও নিত্য। স্থূলভাবে দেখলেই মনে হয় যেন মন একটা বিশেষ ঘটনা-সমাবেশের জন্য একটি সাধারণ অবিভিন্ন শক্তি বিকিরণ করছে। অতএব উপযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা আনন্দের মাত্রা বাড়ান সম্ভব হলেও, কবিতা পড়ে আনন্দ-উপভোগের মত সহজ মানসিক কার্য্যের বদলে সাধারণ পাঠক তার শক্তির মূলধনকে জ্ঞানার্জ্জনের মতন অনিশ্চিত ব্যবসায় খাটাতে অনিচ্ছুক হয়। এই অপচয়ের অনিচ্ছা এবং পূর্ব্ব পরিচিতের সাক্ষাৎজনিত সহজ-ভাব ও শক্তি-সংরক্ষণের সুবিধা ছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছে দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতের অন্য কোন বিশেষ মূল্য নেই। এর বেশি মূল্য যদি নাই রইল, তাহলে দেশ ও কালের অতিরিক্ত ও অতিক্রান্ত বিশ্বের একটি অর্থ হচ্ছে—দেশ ও কালের মধ্যস্থিত সাধারণ মানুষের নিকট কবির রস-সৃষ্টির সহজ-বোধ্যতা, সহজ-উপভোগ্যতা। বিশ্ব-কবি সর্ব্বসাধারণের কবি, সহজ কবি।

জ্ঞানী পাঠকদের বিশ্ব থেকে বহিষ্কৃত করা যায় না। অধ্যাপকদের সম্বন্ধে দুই মত থাকতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসুর কাছে বিশ্ব-কথাটির অর্থ প্রকাশ পায় তুলনামূলক বিচারের ফলে। অর্থাৎ বিশ্বের এই তাৎপর্য্য অর্জ্জন করতে হয়। এমন একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব তৈরি করা সম্ভব যার দ্বারা কবির প্রত্যেক কীর্ত্তিকে সর্ব্বদেশীয় ও সর্ব্বকালীন রূপসৃষ্টির ধারার সম্পর্কে আনা যেতে পারে। বিনয়াবনত মনে জ্ঞানার্জ্জনের ফলে

সাহিত্য-রূপ সম্বন্ধে গোটাকয়েক মূল তথ্য ধরা পড়ে। পৃথিবীর সব বড় কবিই গোটাকয়েক সাধারণ গুণ ও নিয়ম মেনে চলেন। বাস্তবিক পক্ষে নিয়ম নেই, কিন্তু সুবিধার জন্য সাধারণ গুণগুলিকেই নিয়ম বলা হয়। কয়েকটি গুণের উল্লেখ রসিক সমালোচক করে থাকেন, এই যেমন, প্রত্যেক কবি ও আর্টিষ্টের অনুভূতি নিতান্তই গভীর ও সত্য হবে, সেই গভীর ও সত্য অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করতে প্রত্যেকেই সুসমর্থ হবেন, পাঠকের মনে সেই সব অভিজ্ঞতাকে পুনর্জ্জীবিত করতে প্রত্যেকেই পারবেন ; অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে পাঠকের মনের ও নিজের মনের সৃষ্ট রূপের একটা মিল থাকবেই থাকবে। অতএব কি রকম ভাবে কাব্যের ও আর্টের সাধারণ নিয়মাবলী আর্টিষ্ট ও কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করছে জ্ঞানী পাঠক তাই দেখবেন। তুলনামূলক বিচার করে সেই প্রকাশকে বোঝবার ও বুঝে আনন্দ পাবার প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বিশ্ব-কথাটির অন্য একটি অর্থ সার্থক হতে পারে। প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে বিশ্ব-কথাটি যে ইঙ্গিত বহন করে, সেটি হচ্ছে শ্রদ্ধা, তুলনামূলক বিচার, এবং তারই ফলে 'সৎ'-সাহিত্যের চিরন্তন লক্ষণ-নির্দ্ধারণ।

পূর্ব্বেই বলেছি—একমাত্র সুবিধার জন্যই আর্টের সাধারণ লক্ষণগুলিকে নিয়ম বলা যেতে পারে। নিয়ম বললেই আইন-কানুন কিংবা নীতি, অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের কথা মনে হয়। এই রকম নিয়মে আর্টিষ্টের স্বাধীনতা খর্ব্ব হয় মনে করা স্বাভাবিক। কে না জানে যে আর্টিষ্টকে, কবিকে কেবলমাত্র ঐতিহ্যের সম্পর্কে এনে তার সৃষ্টিকে বিচার করলে, তার অন্য দিক্‌টা, অর্থাৎ

সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার ব্যক্তিগত সত্তার দিকটা ফাঁক পড়ে যায়? ঐতিহ্যের এই প্রকার ঐকান্তিক ধারাবাহিকতার ধারণার দ্বারা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করা সম্ভব হলেও সে উপায়ে সৃষ্টি-রহস্যের একটি মূল কথা প্রকাশ পায় না। সৎ-সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ-গুলিকে নিয়ম মনে করা শুধু সুবিধাজনক বলে এবং তারই ফলে নিয়মের ধারাবাহিকতা আর্টিষ্টের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যকে অনেক সময় বাধা দেয় বলে, রস-সৃষ্টির ও রসোপভোগের অন্য একটি ঐক্য-বিধায়ক মূল তত্ত্বের সন্ধান করা দরকার। (রবীন্দ্রনাথ সে সন্ধান নিজেই দিয়েছেন)। মূল তত্ত্বটি হলো পার্সন্যালিটি। ব্যক্তিত্বের এই সংজ্ঞাটিতে সৃষ্টির ভেতর ও বাইরের প্রধান তথ্যগুলি সূচিত হয়, ভেতরের সৃষ্টি-চাতুর্য্য এবং বাইরের সৎ-সাহিত্যের লক্ষণগুলি। কারণ, পাত্রই দেশ ও কালকে ঐতিহ্যের ধারা প্রাণবন্ত করে অতিক্রম করে। পাত্রটি শুধু কোন ব্যক্তি-বিশেষ নয়, বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তার অন্য গুণ যথেষ্টই রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য-বিকাশের ধারার মধ্যেও এমন অনেক সাধারণ গুণ রয়েছে যাদেরকে ব্যক্তির সম্পর্ক থেকে পৃথক করে বাহ্য বিষয় বলে গণ্য করা অসম্ভব নয়, বরঞ্চ স্বাভাবিক—কারণ, প্রত্যেক সৎ-পুরুষের কার্য্যই হচ্ছে নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সর্ব্বাত্মক করে তোলা। পার্স্যন্যালিটির প্রধান লক্ষণই এই। (রবীন্দ্রনাথ একেই ক্রিয়েটিভ্ ইয়ুনিটি বলেন)। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মধ্যে মৈত্রীভাব রয়েছে। সে বিকাশের গোড়ার কথা এই—বিশেষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির প্রেরণায় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সকলের

সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে, এবং সেইজন্য ঐক্য ও বিশ্বজনীনতা লাভ করে। পাঠকের বৈশিষ্ট্য যত বিচিত্রই হোক্ না কেন, আর্টিষ্টের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশে, তাঁর বিকাশধারায় এসে, তাঁর ও অন্যের থেকে নিজের পার্থক্যটুকু হারিয়ে ফেলে, একত্রে সম্পূর্ণ হয়। এই ধরণের সম্পূর্ণতাই হলো ব্যক্তি-বিশেষের সফলতা। এক কথায়, আর্টিষ্টের সৃষ্টিতে ছোট আমিটা পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হয়ে বড় আমিতে পরিণত হয়। প্রত্যেক পাঠকেরই অভ্যন্তরে, নিজের অজানিত অবস্থায়, এই নতুন সৃষ্টি চলতে থাকে। অতএব এই সৃষ্টি কারুর নিজের সম্পত্তি নয়। তবুও লোকে ভাবে অন্য কথা—কেননা, সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রথম অভিজ্ঞতা তার নিজত্বটুকু নিয়ে। যদিও হয়ত কোন সম্পূর্ণ অর্থাৎ সৎ-পুরুষের সাহায্যে সেই নিজত্বকে লোপ পাওয়ানই তার শেষ অভিজ্ঞতা। কবির ব্যক্তিত্ব সমুদ্র-বিশেষ, তার মধ্যে সকল বিশেষের নদ-নদী সম্পূর্ণ হতে পারে। তিনি সৎ-পুরুষ, অতএব তিনি বিশ্বের।

পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যগুলি সাধারণের বেলা এবং রসগ্রাহী জ্ঞানী পাঠকের বেলাতেও খানিকটা খাটে। সত্য কথা এই যে, মানুষই মানুষের প্রধান আগ্রহের বস্তু, তার আনন্দের প্রধান উপাদান। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে সম্পূর্ণ ও সার্থক হবার তাগিদ্ রয়েছে — সে জানুক, আর নাই জানুক — যে জানে, সেই তাগিদ সম্বন্ধে যে সচেতন, সেই জ্ঞানী, যে জানে না সেই সাধারণ। সাধারণ মানুষ পরিপূর্ণ হতে পারে না, অন্ধ-জীবনস্রোতে নিজত্বটুকু হারিয়ে ফেলে। এর জন্য তার বরাবরই একটা ক্ষোভ

থেকে যায়। সে ক্ষোভ যখন ঈর্ষাতে পরিণত না হয়, তখনই সাধারণ ব্যক্তি কোন সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে আশা মেটায়, ক্ষতিপূরণ করে। এটা হয়ত বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়, কিন্তু বুদ্ধি-নামক ইন্দ্রিয়টা সকলের থাকে না, যাদের থাকে তারা আর্টিষ্টের অসম্পূর্ণতা দেখাতেই ব্যস্ত। যাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত, তাঁরা সৎ-সাহিত্যের লক্ষণ নিরূপণ করতেই ব্যস্ত। সাধারণে অ-সাধারণের মধ্যে নিজের আশা মেটান; নিজের অপূর্ণতার ক্ষতিপূরণ করা অন্তত বহির্মুখী স্বভাবের রীতি। যাঁরা অন্তর্মুখী তাঁরা একটি মহান্ ব্যক্তিত্বকে নিজের মধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে এনে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে প্রয়াসী হন। উভয় ক্ষেত্রেই পাত্রের বিশেষত্বটুকু বড় আধারের আশ্রয়ে সার্থক হয়। অতএব এই একীকরণ শুধু দেশ, কালের বাইরে নয়, নিজ পাত্রেরও বাইরে। আর্টিষ্টের ব্যক্তিত্ব যদি সাধারণের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের তাগিদ কিংবা ক্ষোভ মেটায়, তাকে প্রকাশ করেই হোক্, কিংবা তাকে হৃদয়ে ধারণ করেই হোক্, তাঁর সৃষ্টি যদি আমাদের সৃজনী-শক্তিকে প্রবুদ্ধ করে, তাহলে সেই আর্টিষ্টকে বিশ্ব-কবি নাম ছাড়া অন্য নাম দেওয়া যায় না। ব্যক্তিত্ব-বিকাশই হলো বিশ্ব-কবির মর্ম্মকথা।

অবশ্য একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতিভাশালী ব্যক্তির পার্থক্য অনেক। সাধারণের আধার ছোট, তার প্রেরণা দুর্ব্বল, তার তাগিদের জোর কম। কিন্তু কোথায় যেন একটা সুনিশ্চিত মিল থাকেই থাকে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির মধ্যে, যে জীবনী-শক্তির লীলা সকলের মধ্যেই চলছে, সেই জীবনী-শক্তিরই অভিব্যক্তি পুনরাবৃত্ত হয়—তবে দ্রুততরভাবে, সংক্ষেপে, অথচ

অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে। প্রত্যেক জীবেরই জীবনে তার শ্রেণীগত ইতিহাসের পুনরাভিনয় হয়। যে সব জীবের জন্য শ্রেণীর উন্নতি সাধিত হয়, তার মধ্যে জীবনী-শক্তি চৌদূনে চলে। মনে হয়, যেন জীবনের তাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে, সুর ও লয় ভ্রষ্ট হয়েছে, নতুন কিছু সংসাধিত হচ্ছে। মানসিক জগতেও এই নিয়মের বড় বেশি ব্যতিক্রম হয় না। মনের ইতিহাসে, সাধারণ মানুষ এখনও যৌবনে, অর্থাৎ সভ্যতার স্তরে পদার্পণ করেনি। এখন যদি দেখি, কোন মানুষের সৃষ্টিতে, তাঁর সর্ব্বাঙ্গে সভ্যতার রাজটিকা পরান, শুধু তাই নয়, মনের ভবিষ্যৎ গতির একাধিক ইঙ্গিত তাঁর প্রত্যেক কর্ম্মে ও চিন্তায় নির্দ্দিষ্ট হচ্ছে, তখনই সে মানুষের সঙ্গে বিশ্ব-কথাটি জুড়ে দিতে পারি। কেননা, মানসিক বিবর্ত্তন ঘটছে, এবং ঘটছে বলেই সেটি কোন বিশেষ যুগের ও দেশের সম্পত্তি নয়; কেননা স্থান ও কাল সেই বিবর্ত্তন বোঝবার সুবিধাজনক সঙ্কেত মাত্র। এই মানসিক বিবর্ত্তনের গতিকে নিজের আধারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করান, কিংবা তার শক্তিতে শক্তিমান হওয়া যদি প্রত্যেক পাত্রের চরম সার্থকতা হয়, তাহলে স্বাতন্ত্র্য হয়ে ওঠে বিশ্বজনীনতা। এবং যে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে এই গতি সুন্দরভাবে, অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হচ্ছে, তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্ব-মানব।

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রত্যেকেই, দেশ ও কাল নির্ব্বিশেষে, নিজের বিকাশমর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারে। এতে নিজের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয় না, নিজের শক্তির অপচয় হয় না,

সে বিশেষ শক্তি সঞ্চিত, সার্থক, সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যেকের বিশেষত্ব তাঁর বিশেষত্বের মধ্যে, তাঁর বিরাট বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে শতদলের মতন ফুটে উঠতে পারে। প্রত্যেকের স্বভাব তাঁর সৃষ্টিতে চরিতার্থ হয়। স্বভাব কথাটির ছুটি অর্থ আছে—একটি, মাত্র প্রকৃতির দান, যেটি স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি, অন্যটি সেই দানেরই সার্থক মূর্ত্তি, পরিপূর্ণতা, সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সুন্দর ইমারৎ। এ ছু'টি অর্থ যেখানে এক হয়ে যায় সেইখানেই সার্ব্বজনীন পরিমাণ, সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি ও উন্নতি সূচিত হয়। (যেমন য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের পরিমাণ, পরিণতি ও উন্নতি সূচিত হয়েছিল রোমান জুরিষ্টদের সাধারণ ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে।) সেইভাবে যদি আমাদের দেশাত্মবোধ তাঁর বিশ্ববোধে পরিণত হয়, তাহলে তিনি কেবল আমাদের দেশের নন্, সকল দেশের। যদি বর্ত্তমান সভ্যতার গতি ও উন্নতি তাঁর চিন্তায় ও কর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহলে তিনি ভবিষ্যৎকালের, অর্থাৎ বর্ত্তমানের সম্পর্কে সকল কালের। যদি তাঁর রচনার মধ্যে আমাদের দেশের ও অন্য দেশের রস-সৃষ্টির ধারার প্রধান পর্য্যায়গুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেই ধারার ভবিষ্যৎ গতি ইঙ্গিত করে, তাহলে তিনি কেবল আমাদের ও অন্যদের দেশের ঐতিহ্যে আবদ্ধ নন্—তিনি হ'ন, সৎ-সাহিত্যিক, অর্থাৎ বিশ্ব-সাহিত্যিক। যদি তাঁর সঙ্গীত-রচনায় আমার সঙ্গীত-প্রিয়তার, আমাদের ও অন্যদেশের সঙ্গীত-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি, তাহলে তিনি শুধু আমাদেরও নন্, তাঁদেরও নন্, তিনি

বিশ্বের। যদি তাঁর কাজের মধ্যে জীবনের সারধর্ম্ম অনুসৃত হচ্ছে দেখতে পাই, তাহলে তিনি সর্ব্ব-জীবনের। যদি তাঁর মধ্যে সাধারণ মানুষের আশা-ভরসা, চিন্তা, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের নিষ্কর্ষ-সাধন হচ্ছে মনে হয়, তাহলে তিনি সর্ব্বসাধারণের।

এই রস-সৃষ্টিধারার, এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের, এই জীবন-ধর্ম্মের পুনরাবৃত্তির দিক থেকে তাঁকে আমি বিশ্ব-কবি বলি। লোকেও তাই বলে। অতএব এই আখ্যা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্ব-জ্ঞান বাড়ান, সে দায়িত্ব-জ্ঞান দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না হতে দেওয়া, এইটাই হলো বিশ্ব-কথাটির প্রকৃত অর্থ-জ্ঞান। নামকরণের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব লুকান থাকে। সে সম্বন্ধে সচেতন হলে নাম-ধারীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখান হয়। তাঁর কর্ত্তব্য তিনি করেছেন, এখনও করবেন—তাঁর দায়িত্ব তাঁর নিজের প্রতি। তাঁর প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে এই বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া। লিখে, চিন্তা করেই তিনি ক্ষান্ত, আমাদের সাধনার কিন্তু অবসান নেই। রস-সৃষ্টি করে তিনি হন সারা, মোদের কিন্তু এই হলো সুরু।

বৈশাখ ১৩৩৯

দেশ ও প্রগতি

দেশের কথা

প্রগতি

দেশের কথা

আমাদের ছেলে বয়সে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, গুরুজনেরাই রাজনীতির চর্চ্চা করতেন। সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকখানায় বসে হোইটহলের আদ্যশ্রাদ্ধ হোত। সে শ্রাদ্ধসভায় গবর্ণমেণ্টের legislative, executive এবং judicial functions-এর পৃথকীকরণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণোচিত কূটতর্ক উঠ্‌ত! সে তর্কে বিলেতী শ্রুতিস্মৃতির বিচার চল্‌ত। এবং সে বিচারের শেষে ব্রাহ্মণ-বিদায়ের ঝামেলা সহ্য করতে হোত অন্তঃপুরস্থ মহিলাদের। আমার বিশ্বাস, সেই থেকেই ভারতললনা 'সাধের ঘুমঘোর' থেকে প্রথম জেগে উঠলেন। বৎসরের শেষে, বড়দিনের ছুটিতে কংগ্রেসের ডেলিগেট্‌ হয়ে কর্ত্তারা দেশভ্রমণে বেরুতেন। বৎসরারম্ভের পর একমাস পর্য্যন্ত ফিরোজসা মেটা, সুরেন্দ্র-নাথ, দিনসা ওয়াচা ও মালব্যজীর ইংরেজী বক্তৃতার তুলনা-মূলক বিচার চল্‌ত। কেউ বল্‌তেন মেটা সাহেবের আওয়াজ সুরেন বাঁড়ুয্যের চেয়ে গম্ভীর, কিন্তু মালব্যজী কি গোখ্‌লের মত অত মিষ্টি নয়। কেউ বল্‌তেন লালমোহনের ইংরেজী সবচেয়ে ভাল ছিল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতেন, বাঙ্গালীর কাছে কেউ লাগে না, কি বুদ্ধি, কি বিদ্যায়, অর্থাৎ ইংরেজী বক্তৃতায়।

তারপর স্বদেশী যুগ। লাল, বাল, পাল, তখন দেশের দেবতা, অরবিন্দ শুধু দার্শনিক। ত্রিমূর্ত্তির পূজা জোরে চল্‌ল। যুবার দল সামনে এলেন, প্রৌঢ়েরা পিছিয়ে পড়লেন। সকলের মুখে বন্দেমাতরং, হাতে আনন্দমঠ, পরণে জোলার ধুতি, পকেটে যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরং,

যেথায় সেথায় সভাসমিতি, সকালে বিকালে স্বদেশী গান ও মিছিল, রঙ্গমঞ্চে প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, মুখের ও কলমের ভাষা তেজোময়, ডেপুটি মশায়দের গৃহবিচ্ছেদ, উকীলদের জয়জয়কার। আমরা, ছেলেছোকরারা তখন মেতে উঠিছি, প্রধান কাজ আমাদের ভলান্টিয়ারি করা,—ভোরবেলা লাঠিখেলা, দুপুরবেলা স্কুল পালিয়ে গানের মহলা দেওয়া, বিকেলবেলা দেশী কাপড় ফিরি করা, রাত দশটায় বাড়ী ফেরা। তখন আমাদের আকাশে বাতাসে মাদকতা, প্রাণে আশা, মনে আবেগ। স্বদেশী বস্ত্রালয়, স্বদেশী ফ্যাক্টরী, স্বদেশী স্কুল, স্বদেশী সাহিত্য, স্বদেশী গান, স্বদেশী ব্যবসা বাণিজ্য, স্বদেশী মন, স্বদেশী যুগ।

ধূমকেতুর মতন হঠাৎ কোথা থেকে বিপ্লবপন্থীরা এসে হাজির হলেন। ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে উঠ্‌ল। রিজলী-সার্কুলারের দোহাইএ স্কুলের মাষ্টার ও বাড়ীর কর্ত্তারা আমাদের সঙ্গীবিচার সুরু করলেন। এধারে, উত্তর বঙ্গের জনকয়েক ছেলে স্কুল ছেড়ে কোলকাতায় এসে হাজির। জাতীয় বিদ্যালয় তৈরি হলো, জনকয়েক ভাল ছেলে সেখানকার অধ্যাপক হলেন। তাঁরাই হলেন আমাদের আদর্শ। তাঁদেরই মধ্যে একজনের ভাষায় বলতে গেলে, কর্ত্তারা গেলেন 'ভড়কে'। কর্ত্তারা স্বদেশী ব্যবসায়ে কিছু টাকা দিয়েছিলেন, সে টাকা আর ঘরে এলো না। লক্ষ্মী-ছেলেদের হাতে কাজ কমে এল, তাই দলে দলে বিজ্ঞান পড়তে সুরু করলাম। কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাসে ছেলে ধরে না। সন্ধ্যাবেলায় এঁরাই নরনারায়ণের সেবা করতেন নৈশ বিদ্যালয়ে পড়িয়ে। জনকয়েক পিক্‌রিক্ অ্যাসিড্ নিয়ে পরীক্ষাও করতেন। যাঁরা বিজ্ঞান পড়তেন না তাঁরা

ভাল ভাল চাকরী নিলেন। যাঁরা বাকী রইলেন কিংবা যাঁদের পুরাতন ইতিহাস 'নির্ম্মল' নয়, তাঁরা হলেন ব্যবসায়ী কিংবা রিসার্চ্চ-স্কলার ও অধ্যাপক।

তারপর গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। তখন যুদ্ধ বেধেছে, যুদ্ধের বাজারে দেশ বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করল। বাংলা দেশের প্রাদেশিক কৃষ্টির অভিমান ভাঙ্গতে আরম্ভ হলো। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ তখন জেগে উঠ্‌ছে, তারা বাঙ্গালীর দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি পেলে। 'নিখিল-ভারতীয়তা'র হাল্‌কা হাওয়ায় তারা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। জালিয়ানওয়ালাবাগের পর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলো। বাংলার অন্তরীণ নীতিটা ছিল দেওয়ানী মোকদ্দমার মতন, পাঞ্জাবের কাণ্ডটা হলো ফৌজদারী মামলা, তাই অতি সহজেই লোকের মন উত্তেজিত হলো। নতুন আন্দোলনে বিস্তর লোক দেশের জন্য 'একটা কিছু' করবার সুবিধা পেলে। স্বদেশী যুগে যে প্রাচীন ভারতের রঙ্গীন ছবি আঁকা হয়েছিল, আজ তারই আভাস পাওয়া গেল—সেই ত্যাগধর্ম্মে, সেই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনে, সেই ধর্ম্মপ্রাণতায়। কিন্তু ইংরেজী-সভ্যতায় অনুপ্রাণিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, মোহ না কাটাতে পেরে, প্রাণ খুলে অ-সহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে পারলেন না। বুঝেসুঝেই গান্ধীজী তাঁদের সাহায্য চাননি। বেকারের দল বড়ই মুস্কিলে পড়লেন, আন্দোলনে যোগ না দিলে দেশদ্রোহী হতে হয়, তাই যোগ দিতে হলো, আধখানা প্রাণ ও সিকিখানা মন নিয়ে। এই অবস্থা থেকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বাঁচালেন চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল, স্বরাজ-দল তৈরি করে। ঘরের মধ্যে থেকেই

ঘর ভাঙ্গার ফন্দী আমাদের মনোমত, তাই আমরা স্বরাজিষ্ট্ হলাম।

কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়। বুদ্ধির, বিশেষত, আমাদের দেশের শিক্ষাদ্বারা মার্জ্জিত বুদ্ধির এক-চতুর্থাংশের এমন কোন সাধ্য নেই যে ভাবাবেগকে রুদ্ধ করে। ভাবাবেগ জোরে বইল ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এতদিন যে বন্ধন ছিল সেটা ছিল মাটির বন্ধন, এখন থেকে যে ঐক্য তৈরি হতে লাগল, সেটা চেতনার স্তরের। দু'দলই ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের মধ্যে পার্থক্যটুকু অ-স্বীকার করলেন। দু'দলই ন্যাশন্যালিষ্ট্, কিন্তু একদল ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বিদেশে জাতীয়তার ধর্ম্ম-কেন্দ্র খুঁজতে ব্যস্ত হলেন। কংগ্রেস আর গান্ধীজী এক হয়ে গেল। তার পর, তিনি মহাত্মা কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পলিটিসিয়ান এই বুঝতে বছর পাঁচেক কাট্‌ল! দেশের ইতিহাসে ও কটা বছর নিমেষ মাত্র। শেষে সিদ্ধান্ত হলো, ধর্ম্মই হলো তাঁর পলিটিক্স্ আর পলিটিক্স্ই হলো তাঁর ধর্ম্ম। যুগান্তরের বাণী এতদিনে সার্থক হলো, মূর্ত্ত হলো। ভাগ্যিস সাইমন-সপ্তক এলেন, তাই আমরা বিরোধের নতুন বিষয় পেলাম। অকিঞ্চিৎকর আইনকানুনের নিষ্ফল তর্ক-বিতর্ক নিয়ে দেশ বেশিদিন খুশী থাকতে পারে না। পুরানো কর্ত্তার দল তখন প্রায় গত, না হয় অবসর গ্রহণ করে ধর্ম্মচর্চ্চা করছেন কিংবা কীর্ত্তন গাইছেন। যুবার দল তখন জেলে গিয়ে ভুগছেন কিংবা ফিরে এসে গৃহস্থালীতে মন দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন মারা গেলেন, মতিলালজী ছেলের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। Holy

Ghost তখন সম্পূর্ণভাবে Son-কে আশ্রয় করবার সুবিধা পেলেন। কামাল পাশা খিলাফৎ আন্দোলন চালাতে দিলেন না। বাইরের বিরোধ-প্রণালী বন্ধ হয়ে বিরোধের আবেগ ঘরের মধ্যে চলে এল। ধর্ম্মের নামে চাকরী ও ভোটসংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শেষে দাঙ্গাহাঙ্গামা পর্য্যন্ত চল্‌ল খুব। মহাত্মাজী দেশকে বিরোধের নতুন প্রণালী দেখিয়ে দিতে আত্মনির্ব্বাসনদণ্ড তুলে নিলেন। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করলেন না। তবুও তাঁর প্রভাব অপ্রতিহতই রইল। তাঁর এই পুনরাভিষেকের কথা সকলেরই মনে আছে। তার পর জোরজবরদস্তী, সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স, বাংলা-দেশ পিছিয়ে পড়ার জন্য বাঙ্গালীর রাগ ও অভিমান, এলাহাবাদ পণ্ডিতবর্গের নেতৃত্ব, বম্বে, আমেদাবাদ, কোলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের কবলে মহাত্মাজী ও মদনমোহনের আত্মসমর্পণ, গোলবৈঠক, মহাত্মাজীর বিলেত যাত্রা, সেখানকার নিষ্ফলতা, রাজা-রাজোয়াড়াদের আকস্মিক দেশপ্রীতি, সাম্প্রদায়িক গৃহবিবাদ, খাজনা না দেওয়ার হুকুম-জারির জন্য কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করা, এ সব ত' কালকার ঘটনা।

আজকার অবস্থা এই, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যা দেবেন আমাদের তাই নিতে হবে। গৃহবিবাদের মীমাংসার ভার দিয়েছি তাঁদের উপর, তাঁরা অর্থে কনসারভেটিভ, কেননা মন্ত্রীরা ঐ দলের ক্রীড়নক মাত্র। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতারাই জেলে, যুবক-সম্প্রদায় চুপ্‌চাপ্‌, মজুরের দলে মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ করছেন, হিন্দুরা অভিমান করে বসে আছেন, মুসলমানরা আশান্বিত ও

উৎফুল্ল হয়েছেন, পঞ্চমরা ঠিক্ করতে পারছেন না কোন্ দলে যাবেন, নরম-পন্থীরা একটু চড়া সুর ধরেছেন তাঁদের খাতির কমে যাচ্ছে বলে। এক শুধু স্ত্রীজাতি মাথা ঠাণ্ডা রেখে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোটাকয়েক মূলকথা প্রস্তাববদ্ধ করেছেন। এবং রাজ্য-চালকেরা ও বিলেতী খবরের কাগজওয়ালারা হাঁসছেন। অনুষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস ভেঙ্গে গেলেও কংগ্রেস না হলে কোন বন্দোবস্ত গ্রাহ্য হবে না এই ধারণাই হলো ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল ইতিহাসের মোটা কথা।

এ ছাড়াও আমাদের ইতিহাসের অন্য ধারা আছে। কিন্তু চোখে পড়ে না, সে ধারা মরা নদীর মতন ঝির ঝির করে বইছে। রামন নোবেল-প্রাইজ পেলেন, মেঘনাদ, সত্যেন নতুন চিন্তা করছেন, রবি ঠাকুর নতুন বই লিখলেন, ভাতখাণ্ডের স্বপ্ন আংশিকভাবে সার্থক হলো, মজুররা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে, বারদলী ও যুক্তপ্রদেশে চাষীরা নিজেদের স্বার্থ বুঝছে, বাংলা দেশে সাহিত্যের নেশা ধরল, দিল্লীতে Council of Agricultural Research খোলা হলো, পুণা ও কোয়েম্বাটুরে নতুন শস্যের পরীক্ষা আরম্ভ হলো, লোক-সংখ্যা বেড়ে চল্‌ছে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চাকরী না পেয়ে, আন্দোলনে যোগ না দিতে পেরে অনাসৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন কিংবা চুপচাপ্ বসে আছেন, এসব ঘটনাগুলি চোখে পড়ছে না। কেন চোখে পড়ছে না তার কারণ বার করতে গেলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হতে হয়। কিন্তু একটু বাইরে থেকে কারণ খুঁজতেই হবে, নচেৎ ভবিষ্যৎকে গোটা-কয়েক অন্ধ শক্তির হাতে ফেলে দিতে হবে। হয়ত

কি জাগ্রত, কি অন্ধ শক্তি কিছুই নেই। তাই যদি হয়, তাহলে যা হচ্ছে তাই ভাল হচ্ছে মনে করে সুখনিদ্রায় বিভোর থাকাই একমাত্র উপায়!

অল্প কথায় আমি এই কারণগুলি ইঙ্গিত করছি।

১। পলিটিক্‌স্‌ই হয়েছে আমাদের একমাত্র ভাব, একমাত্র ধর্ম্ম।

২। কিন্তু পলিটিক্‌স্‌কে আমরা জ্ঞানের বিষয় করিনি, ভাবরাজ্যেই রেখেছি। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন সত্যকারের anti-intellectual ভাববিলাস মাত্র।

৩। প্রধানত এই জন্য সে আন্দোলনের সঙ্গে নানা অবান্তর জিনিষ মিশেছে, যেমন ধর্ম্ম, মেয়েলী অভিমান, এক কথায় অ-বাস্তবতা।

৪। এই আন্দোলনের যতটুকু চেতনার ক্ষেত্রে, ততটুকুতেই বিরোধ। সর্ব্বদাই বিরোধের বস্তুকে একমাত্র সত্তা বিবেচনা করা বুদ্ধির একমাত্র অভ্যাস হয়ে উঠেছে। এ লক্ষণগুলি শুভ নয়। ভবিষ্যতে যদি এই মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহলে ক্ষতি বই লাভ হবে না। কোন্ ধরণের ক্ষতি হবে প্রবন্ধের শেষে আভাস দেব।

প্রথমেই একটা আপত্তির জবাব দিই। অনেকে বলেন, এ ছাড়া উপায় ছিল না। এক কথায় তাঁদের মতে, কারণগুলি ঐতিহাসিক। কিন্তু ইতিহাসের দৈবশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে আমার ভীষণ আপত্তি। আমাদের পরাধীনতাই হলো একমাত্র fact। এটা এতদিনের পুরানো fact যে সেটা স্বাভাবিক ঘটনা, যেন দিন রাত্রির মত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সভ্য মানুষ

স্বাভাবিক ঘটনাকে কেবল স্বাভাবিক বলেই ছেড়ে দিচ্ছে না। তাকে ভাঙ্গছে, নতুন করে গড়ছে। আমাদের পরাধীনতার মত কোন স্বাভাবিক ঘটনার শক্তিকে ও কার্য্যকে প্রত্যাহত করতে হলে নতুন কোন ইতিহাস তৈরি করতে হবে। আমরা পরাধীন এটা fact, আমাদের স্বাধীন হতে হবে—এটা হলো দায়িত্বপূর্ণ event। শুধু তাই নয়। ধরা যাক্ fact ও event-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবু পরাধীন হলেই যে ভাববিলাসী হতে হবে, কিংবা জীবনের অন্য সব মূল্যজ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিতে হবে, কিংবা স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য, সর্ব্বজন স্বীকৃত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, যে কোন অস্ত্র, যেমন ধর্ম্মকে প্রয়োগ করতে হবে এমন কোন কথা নেই। ধর্ম্ম বলতে যদি ইংরেজী religion বোঝা হয়, তাহলে অবশ্য অন্য কথা। ধর্ম্মের যে অর্থ এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ইংরেজী প্রতিশব্দ spirituality, সেটা ব্যক্তিবিশেষের গুহ্য সম্পদ, তাকে অন্য কাজে লাগান যায় না। এ দু'টি জবাব ছাড়া অন্য একটি জবাব দেওয়া চলে। যদি কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে সঠিক্ নিরূপিত করে, তাহলে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধটিকে mechanical sequence বলা হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধকে ঐতিহাসিক ধারা বলা চলে না। আমাদের ধারণা আছে যে, আমরা খুব ধর্ম্মপ্রাণ, অর্থাৎ anti-mechanical, তবু কেন যে পরাধীনতার ইতিহাসই স্বাধীনতার পন্থা কেটে দেবে, অর্থাৎ যা ঘটেছে তাই ঠিক এবং সেইজন্যই যা ঘটবে তাই ঠিক হবে আমরা বিশ্বাস করি, বুঝি না। সত্যকারের ধর্ম্মের মধ্যে পুরুষকারের স্থান আছে, ঐতিহাসিক দৈবের

স্থান কম। স্রোতে গা ভাসানকেই যদি সাঁতার কাটা বলি, বিদেশী সভ্যতার বিপক্ষতা আচরণের জন্যই যদি ধর্ম্মাত্মা হই, তাহলে অবশ্য গত পঁচিশ বছরের ইতিহাসের সমালোচনা করা যায় না, সে ইতিহাসকে ভগবানের ইচ্ছা বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।

এইবার আমি কারণগুলির ব্যাখ্যা করছি। আমার আশা এই যে, আমাদের জীবনের অন্য ধারাগুলো কেন চোখে পড়ে না বুঝতে গেলেই সে ধারাগুলি প্রকট হয়ে উঠবে। পলিটিক্‌স্‌ই যে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং সেইজন্যই মন অন্য কোন চিন্তাকে স্থান দিচ্ছে না তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বোম্বাই অঞ্চলের হিন্দু জীম্‌খানা থেকে এবার কেউ বিলেতে ক্রিকেট খেলতে গেলেন না। সব বড় বড় খেলাতেই মোহনবাগানের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নির্ব্বাচিত হবার জন্মগত অধিকার প্রকাশ্যে অস্বীকার করার বিপদ আছে। এমন খুব কম খেলা দেখেছি যেখানে দেশী টিম বিলাতী টিমের কাছে নিজের দোষে হেরে গিয়েছে—দর্শক স্বীকার করেছেন। খেলা দেখাই বাঙ্গালীর প্রধান কাজ, সেইখানেই এই। কলেজ ও স্কুলের মাষ্টারদের বিশ্রামের ঘরে পলিটিক্‌স্‌ ছাড়া অন্য আলোচনা শুনেছি কিনা মনে হয় না। বড় বড় অধ্যাপকরা যখন রিসার্চ্চ করেন, তখন তার মধ্যে জাতীয়তার ও দেশাত্মবোধের ছাপ না থাকলে, তাঁদেরকে আমরা দেশদ্রোহী ভেবে থাকি। Scientific কিংবা higher criticism যে একদম বিদেশী ও দাসমনোভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় এই ধরণের মন্তব্য প্রকাশ করে একজন প্রবীণ অধ্যাপক আমার এক পরিচিতের একখানি উৎকৃষ্ট

পুস্তকের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। আমাদের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের মনে, যেখানে আমরা পলিটিক্স্ ছাড়া অন্য চিন্তাধারার প্রবাহ আছে আশা করিতে পারি, সেখানেও এই জাতীয়তা কি সূক্ষ্মভাবে ও অলক্ষ্যে কাজ করছে দেখলে অবাক হতে হয়। ভারতবর্ষে জাতিবিভাগ আছে, কিন্তু সেটা পশ্চিমা সমাজের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগের চেয়ে ভাল, বাল্য-বিবাহ আছে, কিন্তু তাতে অন্যান্য কুফলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আমাদের আধ্যাত্মিক গুহ্য-ধর্ম্ম জীন্স্, এডিংটন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মতে বিজ্ঞানেরই চরম কথা। আমাদের চাষ-বাস, শিক্ষাপদ্ধতি সব কিছুই অন্য দেশের তুলনায় কত ভাল এ সব শুধু লালা লাজপৎ রায় কিংবা রঙ্গ আয়ার লেখেন না, এ সব কথা আমাদের পণ্ডিতবর্গকেও লিখতে হয়, নচেৎ রক্ষা নাই। অধ্যাপকদের মধ্যে বুদ্ধিমানরা বলেন যে, যেকালে আমরা ঐ সব রীতি, নীতি, পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, তখন ও সব আমাদের পক্ষে ভাল বলতেই হবে। এ তর্কটা খাটে জীবজগতে। মানুষের বেলা অবশ্য ঐতিহ্য কথাটি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যেও ফাঁকি কোথায় পূর্ব্বেই দেখিয়েছি। ছবি ও গানে পলিটিক্স্ কতটা ছায়াপাত করেছে, অর্থাৎ দেশাত্মবোধ কতটা প্রবেশ করেছে বিশদ করে দেখাবার অবসর নেই। অজন্তার পচা অনুকরণ করাকে আর্ট ভাবা, সঙ্গীতের উন্নতি অসম্ভব মনে করা, মাদুরা ও জগন্নাথের জবড়জং স্থাপত্যে গৌরব অনুভব, এর মধ্যে সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ নেই, আছে ভাবাবেগের, যার একমাত্র মূল্য থাকতে পারে রাজনীতির ক্ষেত্রে। বুদ্ধির এমন ফাঁকি অন্য দেশে সম্ভব কিনা জানবার প্রয়োজন

নেই, কিন্তু এ দেশে চলছে ও চলা অন্যায় জানি। এ ধরণের স্বদেশিয়াঁনা সাহেবিয়ানারই ওপিঠ।

যখন পণ্ডিতদেরই এই অবস্থা, তখন অন্যে পরে কা কথা! যখন গায়ে ফোড়া হয়, তখন সব ভাবনাই সেই তাড়সে জর্জ্জরিত হয়ে ওঠে। এটা স্বাভাবিক কিন্তু বুদ্ধির কাজই অ-স্বাভাবিক রকমের। অনেকে বার্গসনের নাম উচ্চারণ করে বলে থাকেন যে পলিটিক্স্ কেন সব ক্ষেত্রেই বড় কাজের পিছনে একটা প্রচণ্ড ভাবশক্তি, ভাবাবেগ থাকতে বাধ্য, এবং কেবল বুদ্ধি দিয়ে কোন বড় কাজ করা যায় না। এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে চাই না, বিস্তর হয়েছে। আমি শুধু বলিতে চাই, রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত আন্দোলনের মধ্যে অনেক কার্য্য-বিভাগ আছে। প্রথম, সমগ্র জাতিকে জাগিয়ে তোলা—এটা খুবই প্রয়োজনীয় জিনিষ, খুবই শক্ত কাজ ও একান্ত কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়ত, দাবা খেলার মত বিপক্ষকে মাৎ করা, যেটাকে হয়ত নিতান্ত ছোট কাজ মনে করা হয়। দু'কাজের দু'রকম রীতিনীতি, প্রথমটার strategy, দ্বিতীয়টির tactics। এ ছাড়া একটা কার্য্যতালিকা তৈরি করে সেই মত সমগ্র শক্তিকে নিয়োজিত করার দিকও আছে। নিতান্ত মোটামুটি ভাবে বলা হয় যে, প্রথমটায় ভাবাবেগ, দ্বিতীয়টায় কূটবুদ্ধি এবং তৃতীয়টিতে কল্পনা, মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির বেশি প্রয়োজন। এ ধরণের ভাগ করা উচিত নয়। কেননা আমি জানি যে দেশকে জাগাতে হলেও বুদ্ধির আবশ্যক। একটি ছোট ছেলেকে সন্দেশের লোভ দেখিয়ে, কাতুকুতু দিয়ে, আদর করে জাগান যায়, তার পর ছেলে কেবলই খুঁৎখুঁৎ করে, কোলে উঠে

সন্দেশ চায়, আবার 'খোকা ওঠ, সকাল হয়েছে, মুখ ধুয়ে গাছপালায় জল দিতে হবে, তারপর হাঁসের কলম কেটে ছোট মামাকে একটা চিঠি লিখতে হবে, শুয়ে থাকলে চলবে না,' এই ধরণের কথা কয়ে, ধীরে, মধুরভাবে অথচ দৃঢ়স্বরে ছেলেকে জাগান যেতে পারে। আমাদের দেশের মন যদি জেগে থাকে তাহলে প্রথম উপায়ে। আমরা গান গেয়েছি 'সোণার বাংলা' 'এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি' 'আ মরি বাংলা ভাষা'; ম্যালেরিয়া তাড়ান, দেশকে গড়ে তোলা, বাংলা ভাষার দৈন্য দূর করা, এ সব নিয়ে বেশি মাথা ঘামাইনি। আমরা থিয়েটার করেছি প্রতাপাদিত্য, রাণাপ্রতাপ, ছত্রপতি, নট ও নটীর, নাট্যকার ও শ্রোতার দায়িত্ব না মনে রেখে; শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছি ভিড় করার জন্য; কংগ্রেসে বক্তৃতা দিয়েছি birth right, natural right জন্মগত স্বাধিকার নিয়ে, অধিকার অর্জ্জন আমাদেরকে ব্যস্ত করেনি। খুব চেঁচিয়েছি, গানে, কবিতায়, বক্তৃতায়, লেখায়, কথাবার্ত্তায়, অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করার বদলে তাদেরকে গণ-ঈশ ভেবে খোসামোদ করেছি, বড় বড় নেতাকে পূজা করেছি, তাদের ছবি ঘরে টাঙ্গিয়েছি, মেয়েরা তাদের নামে সাড়ি পরেছেন, ব্যবসাদারেরা তাদের নাম নিয়ে ব্যবসা করেছেন, বিবেকানন্দ ঘৃত, আচার্য্য মিষ্টান্নভাণ্ডার, গান্ধী সিগারেট, সুভাষ পুস্তকালয়, ইদানীং আবার ডিক্‌টেটার করছি। শাঁকঘণ্টা ধূপধুনোর কিছুরই ত্রুটি নেই, আছে অভাব স্থির প্রতিজ্ঞার, grim determination-এর, ঋজুতার, obstinate rigour-এর, অভাব আছে, এখানেও বুদ্ধির প্রয়োজনস্বীকারে। একটা এত বড় দেশকে ঘুম থেকে

তোলা খুব বড় সাধনা, সে সাধনা আমাদের নেই, আর নেই বলেই ভাতখাণ্ডেজীর চল্লিশ বৎসরের সাধনা, মেঘনাদ-রামন-সত্যেনের সাধনার, বেঙ্গল কেমিক্যালের রাজশেখর বসুর, যাদবপুরের কর্তৃপক্ষের, দয়ালবাগের সাহেবজী-মহারাজের সাধনার ইতিহাস অল্প লোকেই জানে, আর জানলেও তার খাতির নেই, যতটুকু খাতির আছে তাও ভারতবাসী বলে। এই সব সাধকদের আমাদের কাছে উপকারিতা মাত্র এই বলবার জন্য—'হে ইংরেজ, হে পশ্চিমবাসী, হে বিশ্বের অধিবাসী, তোমরা যে বলতে আমরা কেবল অতীত গৌরব নিয়েই পড়ে থাক্‌ব, আমাদের বড় বৈজ্ঞানিক হবে না, শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি হবে না, এই ভ্যাখ এঁরা কি তোমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিদের চেয়ে কিছু কম !'

দেশ জাগান ছেড়ে দিলে, পলিটিক্‌সের দাবীর অংশ টুকুতে সয়তানী বুদ্ধিরই দরকার। সেখানে 'জয়, অমুকের জয়'এর স্থান নেই, আধ্যাত্মিকতার স্থান নেই, আছে সেখানে মারপ্যাঁচ, দরকষাকষি, আপোষ করবার ক্ষমতা, অর্থাৎ কূটবুদ্ধির প্রয়োজন। এ স্তরে সততা টিকতে পারে না, যদিও পারে, তাও সততা শ্রেষ্ঠ কৌশল হতে পারে এই হিসেবে। যে দেশে ন্যায়শাস্ত্র লেখা হয়েছে, সে দেশের কূটবুদ্ধি নেই বলা যায় না। কিন্তু রাজ্য-শাসন প্রণালী সংক্রান্ত কূটবুদ্ধিতে ইংরেজদের তুলনায় আমরা কোথায় পেছিয়ে আছি তার প্রমাণ হয়ে গেল গোলবৈঠকের সভাতে, মাত্র দু'টি চালে আমরা মাৎ হয়ে গেলাম। প্রথম, প্রধান মন্ত্রীকে সাইমন সাহেব যে চিঠি লেখেন, তার ফলে ভারতের দু'টি অ-সম উন্নত

ও বিষমনৈতিক খণ্ড এক সূত্রে বাঁধা হয়ে গেল। আমাদের মহারথীরা যখন বিলেত পৌঁছলেন তখন প্রথম শুনলেন যে রাজা রাজোয়াড়ারা হঠাৎ দেশভক্ত হয়েছেন। তখন federalism সম্বন্ধে জানবার প্রয়োজন হলো। শিবস্বামী আয়ার নামে একজন নরমপন্থী মাদ্রাজী (যিনি গবর্ণ-মেণ্টের হয়ে মধ্যে মধ্যে ভোট দিতেন) ঐ সম্বন্ধে একটা বই লেখেন। বিলেত থেকে সেই বই পাঠাবার জন্যও তার আসতে লাগল। দ্বিতীয় চাল হলো, কন্‌সার্ভেটিভদের দ্বারা আপত্তি তোলান, সে আপত্তির দ্বারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের ভয় দেখান, তাঁদের মনে 'এই বুঝি সব গেল' ভাবটি সৃষ্টি করা, তার পর ঠোঁটে জলপাইএর ডাল দিয়ে লর্ড রিডিং ও বেন সাহেবকে পাঠান, আপোষ করবার জন্য মধুর বক্তৃতা, তার মধ্যে অমনি, casually, গোটাকয়েক safeguard-এর কথা তোলা। এই হৃদয়-পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, ও সেই উচ্ছ্বাসে federalism এবং safeguards দুইই গলাধঃ-করণ করবার সম্মতি জ্ঞাপন করেছি। আমাদের মত কৃতজ্ঞ জাত পৃথিবীতে দুটি নেই। 'এই বুঝি সব গেল' 'না, অঁা বাচলাম' 'ধন্যবাদ' এই হলো গোল-বৈঠকের পলিটিক্‌স্। এখানে যেটি সংঘটিত হচ্ছে, তাকে মাত্র ঘড়িতে লম্বমান দণ্ডের আন্দোলনের সঙ্গেই তুলনা করা চলে, যার axis হলো হোইটহলে, যার দোলনের শক্তি হলো আশা ও নিরাশা। মোদ্দা কথা দাবার চালে আমরা ঠকেছি, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ক্রাডক্ সাহেবের বক্তৃতা—'নিতান্ত ভালমানুষ পেয়ে এই ধূর্ত্তটি আমাদের ঠকিয়ে গেল।' এই বোকা সাজাটাই

হলো পাবলিক্ স্কুলের প্রধান এবং ইংরেজদের পক্ষে সব চেয়ে উপকারী শিক্ষা।

গোলবৈঠকের কথাও ছেড়ে দিচ্ছি। শুনেছি, এই অ-সহযোগ আন্দোলন পৃথিবীকে বিরোধের একটা নতুন অস্ত্র দিয়েছে। কিন্তু অন্য দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে, এবং এই 'নতুন' আন্দোলনের লক্ষণ দেখলে, লেনিন, কামাল পাসা, মুসোলিনী, রেজা খাঁর কীর্ত্তিকলাপ ও আমাদের নেতৃবর্গের নেতৃত্ব তুলনা করলে মনে হয় যে আমাদের আন্দোলনের মধ্যে দোলনের অংশটুকুই বেশি! ক্রপটকিনের আত্মজীবনী, মির্স্কি কিংবা স্ত্রীর লেখা লেনিনের জীবনীর সঙ্গে মহাত্মাজীর আত্মকাহিনী পাশাপাশি পড়লে একটা ভীষণ পার্থক্য ধরা পড়ে। মহাত্মাজীর জীবনে প্রধান সুর হলো তাঁর নিজের মোক্ষ, ক্রপটকিনের জীবনে প্রধান সুর হলো দলিতের উদ্ধার-সঙ্কল্প। লেনিনের উদ্দেশ্য আরো সীমাবদ্ধ। যে অত্যাচার তাঁদের প্রত্যেকের সহ্য করতে হয়েছিল তার তুলনায় আমাদের জাতির সাধনা অ-বাস্তব ভাববিলাস মনে হয়। মনে হয়, আমাদের সঙ্কল্প দৃঢ় নয়, নিতান্তই অস্থির, আমাদের চিন্তা নিতান্তই ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট। তাই হতে বাধ্য যতক্ষণ না তার পিছনকার ভাবাবেগ, ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা দমিত প্রশমিত ও চালিত না হয়। কিন্তু নিছক ভাবাবেগকে দমন ও চালনা করবে কে? অবশ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁরা মধ্যবিত্তের শ্রেণীভুক্ত। এঁদের প্রকৃত কাজ প্রোগ্রাম বাঁধা। বাংলা দেশে, চিত্তরঞ্জনের প্রেরণায়, কংগ্রেস অফিস তৈরি হয়েছিল, কোলকাতার করপোরেশনটা নিজেদের হাতে

এসেছিল। আমাদের সহরে তারই ফলে প্রাথমিক শিক্ষার অভূতপূর্ব্ব বিস্তার এবং নাগরিক দায়িত্ব প্রচারকল্পে একখানি উৎকৃষ্ট সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়েছিল, পাড়ায় পাড়ায় স্বাস্থ্য-সমিতিও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এছাড়া অন্যত্র, ভেবেচিন্তে একটা কোন নতুন constructive policy খাড়া করা হয়েছিল বলে মনে হয় না। অনেকে বলবেন, আমাদের সময় ছিল না, সুবিধা ছিল না। তা নয়। পাছে কোন প্রোগ্রাম বাঁধতে গেলেই বাধাবিপত্তি এসে পড়ে, এই ছিল আমাদের ভয়। জন্ম-রোধের কথা তুল্‌লে ধার্ম্মিকরা সরে দাঁড়াবেন, শাস্ত্রের নামে আপত্তি তুলবেন, জমি ও আয়ের আপেক্ষিক সমভাগের কথা তুল্‌লেই জমীদার, বিত্ত ও বৃত্তিভোগীর দল পালিয়ে যাবেন—এই ধরণের ভয়কে শক্তির সঞ্চয় বলে এসেছি। তা ছাড়া, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের তরফ্ থেকে এও বলা চলে যে, বর্ত্তমান আন্দোলনটা অনেকটা শিক্ষার ও শিক্ষিত সমাজের বিরোধী। এ শিক্ষার অর্থ অবশ্য বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি। কিন্তু যতক্ষণ না নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির আবিষ্কার ও বহুল প্রচার হচ্ছে, ততক্ষণ এঁদেরকে নিয়েই চলতে হবে। (অ-সহযোগ আন্দোলনের তৈরি 'আশ্রম ও বিদ্যাপীঠে' শিক্ষা যে সম্পূর্ণ হয় না এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত)। নেতাদের বক্তৃতা থেকে মন্তব্য উদ্ধার করে আমার বক্তব্য সমর্থন করতে চাই না। মাত্র একটি উদাহরণ দেব। পণ্ডিত জহরলাল নেরু যখন ১৯৩০ সালে জেলে যান, তখন তাঁর গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ, তাঁর মতের বিপক্ষে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ছাত্রদের কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিতে পরোয়ানা

জাহির করেন। উদ্দেশ্য হয়ত খুবই সাধু ছিল। ফলে তিনমাস প্রায় কলেজ বন্ধ থাকে, বিলেতী জিনিষ কেনাও বন্ধ হয়, কিন্তু কোনটাই ছেলেদের পিকেটিং-এর জোরে নয়, ভাড়া-করা চাষী-ভলান্টিয়ারদের জন্য। যে ছেলেরা কলেজ ত্যাগ করে বাড়ী ফিরে গেল তারাই ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করলে এই সর্ত্তে যে, শিক্ষকেরা যেন অতিরিক্ত বক্তৃতা দিয়ে ঐ তিন মাসের ক্ষতিপূরণ করেন। আমরা ক্ষতিপূরণ করলাম। পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে এবং পরের দিন থেকেই ছাত্রেরা পরীক্ষকদের কাছে এসে, মুখ তুলেই অনুরোধ করলে, 'এবার যখন ক্ষতি হয়েছে, তখন সোজা করে যেন খাতা দেখা হয়, এবং কিছু ফাল্‌তো নম্বর দেওয়া হয়।' এ অবস্থায় বুদ্ধি ও বুদ্ধিজীবীর স্থান কোথায়? স্থান একমাত্র পড়বার ঘরে, ল্যাবরেটরীতে। সেখানেও কান্নার আওয়াজ কানে আসে, তাই শুনে প্রাণটাও ব্যাকুল হয় স্বীকার করলে আশা করি দেশের নেতারা বিশ্বাস করবেন। তাঁদের একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—ঘটনাটি ঘটে সেশনের প্রথম সপ্তাহে অর্থাৎ কলেজের কুশিক্ষা পাবার পূর্ব্বেই।

যত রকম বুদ্ধি-বিরুদ্ধ ভাব এই আন্দোলনের মধ্যে এসেছে তার মধ্যে সব চেয়ে সর্ব্বনাশ করেছে ধর্ম্ম। পুরাতন কংগ্রেসে ধর্ম্মের স্থান ছিল না, ধর্ম্ম তখন ব্যক্তিগত ছিল, লোকের গোপন সাধনা ছিল। কংগ্রেসের কর্ত্তারা গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়া ব্রাহ্ম, আর্য্য কি প্রার্থনা-সমাজী, মুসলমান কি পার্শি হলেও ধর্ম্মের সঙ্গে পলিটিক্‌স্ মেশাননি, অন্তঃপুরবাসিনীকে হাটবাজারে দাঁড় করিয়ে দর কষাকষি

করেননি। বাংলা দেশে ধৰ্ম্ম এই আন্দোলনে নাক ঢোকালে গীতার গৰ্ত্ত দিয়ে। যুগান্তর, বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যার লেখা আমার মনে পড়ে, গীতা-ক্লাসে দু'একবার গিয়েওছি। বারীন্দ্র, উপেন্দ্র নিজেরা স্বীকার করেছেন যে তাঁরা প্রথমেই বুঝেছিলেন যে, ধর্ম্মের সাহায্য ব্যতিরেকে, ধর্ম্মের আশ্রয় ভিন্ন দেশবাসী রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবে না। তাঁদের দাবী গ্রাহ্য করতেই হবে। কেননা এঁদের পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সাধুজনের প্রবর্ত্তিত হিন্দুয়ানীর মধ্যে রাজনীতির রেশ পর্য্যন্ত ছিল না। বরঞ্চ বলা চলে যে, সমাজ-সেবায় তাঁরা ধৰ্ম্মভাব আনতে চেয়েছিলেন। বোধ হয় বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল যে, জীবন্ত সমাজের বন্ধনীকে লোকে ধৰ্ম্ম বলুক। রাজা রামমোহন রায়ের কৃপায় সমাজ-ধৰ্ম্মকেই ধৰ্ম্ম বলতে সাধারণে প্রেরণা পাচ্ছিল। কিন্তু ১৯০৫-৬ সালের গীতাপাঠ একটু অন্য রকমের হলো। সমাজ-ধর্ম্মের এক অংশে, রাজনীতিতে, ধর্ম্মের প্রভাব প্রকাশিত হলো। গীতাপাঠ যখন ছেলেরা আরম্ভ করলে, বৈষ্ণবেরা কেন চুপ্ থাকবেন? আরম্ভ হলো কীৰ্ত্তন, নাচন-কাঁদন, গড়াগড়ি, বৈষ্ণব-সাহিত্য-পাঠ। একধারে অমৃতবাজারের দল, অন্যধারে চিত্তরঞ্জন। চিত্ত-রঞ্জন ধনী, হাতে একাধিক কাগজ। বিপিনচন্দ্র পালকে দিয়ে বলান হলো যে বাংলার বিশেষত্ব হলো এই বৈষ্ণব-সাহিত্যে, ভাবাবেগে, কল্পনায়, এই 'কাছাখোলা ভাবে' ইত্যাদি। Soul of India, বাংলার প্রাণ আবিষ্কৃত হবার পর সেই soulful প্রাণব্যঞ্জক সাহিত্য, কলা, চারু-শিল্প তৈরি ত' হলোই, কৰ্ম্মক্ষেত্রেও তার প্রকাশ সুরু হলো।

এই সময় এলেন গান্ধীজী, আমরা তাঁর মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাণ খুঁজে পেলাম। কিন্তু তিনি মূলত ধার্ম্মিক, তাঁর সমস্যা তাঁর নিজের। তাঁর সমস্যাকে দেশের সমস্যা মনে করা হলো। দুঃখ এই যে, কি করে একজন ব্যক্তির সমস্যা দেশের সমস্যার সঙ্গে মিশে গেল জানতে হলে mass psychology পড়লেই যথেষ্ট হয়, পলিটিক্স্ জানবার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর খিলাফৎ আন্দোলনের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হলো স্বাধীনতার কাজে। খিলাফৎ আন্দোলনের প্রধান কথা—super-territorial sovereignty of the Khalif, আর আমাদের কথা ছিল ভৌগোলিক স্বাধীনতা। সমুদ্রের জল গ্রামের নদীতে প্রবেশ করলে বান ডাকে, কিন্তু তার পর ভাটাও পড়ে। এখন সেই ভাটা চলছে। জোয়ারের জলের অংশ নিয়ে গ্রামের আলের ওপর লাঠালাঠি চলছে। মুসলমান সভ্যতা বলতে ভারতবাসী মুসলমান যা বোঝেন তাতে ধর্ম্ম ও পলিটিক্সের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ পার্থক্যহীনতা গান্ধীজীর মনোমত। তাই সরলা দেবী চরকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের চক্রের তুলনা করলেন, সরোজিনী দেবী চরকা চালিয়ে মাথা ঘুরে অনেক দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন, প্রফুল্লচন্দ্র চরকার প্রসার-কার্য্যে এবং বিদ্যামন্দির, বিশেষ করে ল' কলেজ ভাঙ্গবার ক্রুসেডে দেশে দেশে বেড়াতে লাগলেন। চরকা হলো নতুন জাতীয়তা-ধর্ম্মের ত্রিশূল। এই ধরণের প্রতীক অনেক জুটল। তারপর মহাত্মা-খোঁজার পালা — বেহারের রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মাদ্রাজের রাজগোপালাচারী, সব গান্ধীজীর উৎসবমূর্ত্তি। তাঁদের পূজা অর্চ্চনাই দেশের প্রধান কাজ হলো। এই

দুটো দৃষ্টান্তই ধর্ম্মের জয়-ঘোষণার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই সময় শত শত ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন হয়েছিল, মতিলাল, চিত্তরঞ্জন, তবে সবই revealed ধরণের। গণপূজার মধ্যেও ধর্ম্মের সেই mystic whole, খদ্দরপরিহিতের মধ্যে সেই feeling of the elect, বক্তৃতার সরল ভাষায় সেই sermonising, বিশেষ করে sermon on the mount-এর গল্প, জেল-প্রত্যাগতের মধ্যে সেই feeling of martyrdom, ধর্ম্মের সব কিছুই এই আন্দোলনে জুটেছিল। রুষ, ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে religious revival-এর তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে ধর্ম্মের অংশটুকু ছাড়া অন্য অংশও ছিল। এবং যদি নাও থাকত তাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কিংবা ধর্ম্মকে তাড়াবার দায়িত্ব কমে যেত না। সেই ধর্ম্মাংশটুকুর জন্য সে দেশে যা ক্ষতি হয়েছে তার অনুকরণ করার সার্থকতা আমাদের ছিল না, এখনও নেই। সে যা হোক্, আমাদের দেশে এতদিন আন্দোলনের পরে যদি ঐ ধরণের মিশনারী খৃষ্টানী ধর্ম্মের অনুকরণটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ হয়ে থাকে তাহলে খুব একটা বড় কাজ যে হয়েছে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ধর্ম্মের ঠেলা কতদূর পৌঁচেছে মহাত্মাজীর একটা কার্য্য থেকেই প্রমাণিত হয়। গবর্ণমেণ্টকে জব্দ করবার জন্য তাড়ি বিক্রি বন্ধ করবার প্রয়োজন হয়। মহাত্মাজী তার একটি উপায় পর্য্যন্ত বাৎলে দিয়েছিলেন—উপায়টি তাঁর অন্যান্য উপায়ের মতনই ধার করা। এবার ধার করেন শ্রীরাধার কাছ থেকে, যিনি কৃষ্ণের বাঁশীর ওপর অভিমানে বাঁশী কেন বাঁশ-ঝাড় পর্য্যন্ত উজাড় করতে চান। উপায় ঠিক হলো, তাল গাছ

কাটতে হবে। কাজটা নেহাৎ শক্ত নয়। কিন্তু এই সহজ কাজই একটা ছেলে করে উঠতে পারল না। সে পড়ল তালগাছ চাপা, গেল মারা। মহাত্মাজী তাঁকে martyr বল্লেন। আজ গত কয়েক বৎসর এই martyr কথাটির যত প্রচার হয়েছে অত প্রচার শিক্ষারও হয়নি, চরকারও হয়নি। সাহেব খুন করলে martyr, হিন্দুকে খুন করলে সহীদ, আবার তালগাছ চাপা পড়লেও martyr! তফাৎ কোথায়? তফাৎ নেই, কেননা সব খুনের পিছনে আছে একটা 'ধর্ম্মপ্রেরণা' যার সঙ্গে সাধারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন যোগাযোগ নেই। দণ্ডী যাত্রার কথা, হিন্দু সভা, জমায়েৎ উলেমার কথা সকলেই জানেন। আর জানেন, কিন্তু স্বীকার করেন না, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, তথাকথিত দেশাত্মবোধের বিরুদ্ধে, কোন কিছু বল্লেই, যে বলে তার religious persecution হয়, যেটা Ordinance-এর মতন দেহে না বাজলেও প্রাণে বাজে।

এই প্রকার ধর্ম্মভাবের প্রাতুর্ভাব আমার কাছে আদিম অসভ্যতার পরিচায়ক। জ্ঞানের ইতিহাসে দেখেছি, প্রত্যেক জ্ঞান নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখছে, specialisation কথাটির অর্থই তাই। বিলেতে পলিটিক্‌সের আলোচনা ও ব্যবহার তুই-ই অনেক দিন ধরে চলে আসছে, সে দেশে এরিষ্টটল্ সর্ব্বপ্রথমে পলিটিক্‌স্‌কে ধর্ম্মজ্ঞান, অর্থাৎ এথিক্‌স্ থেকে পৃথক করেছিলেন, মধ্যে মধ্যযুগে ক্যাথলিক চার্চ্চের জন্য, সে পার্থক্য কমে এলেও তার পর থেকে এই পার্থক্যটা চলে আসছে। ফ্যাসিষ্টরা আবার পার্থক্য দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু কম্যুনিজ্‌মের প্রতিকূল শক্তিতে সে চেষ্টা য়ুরোপের অন্য দেশে সফল হবে মনে

হয় না। বর্ত্তমানে সর্ব্বদেশে ধর্ম্মকে রাজ্যতন্ত্র থেকে ভিন্ন করা হচ্ছে। এক মুসোলিনি করছেন না, আর আমরা করছি না। এখানেও আমরা ফ্যাসিষ্ট্। এই আদিমতার উৎপাত সভ্য জগতে একেবারেই অচল। সচল হতে পারে জীবনকে দুইভাগে ভাগ করে, একটা private world আর একটা public world, এবং এই দু'এর যোগটি contractual basis-এর ওপর স্থাপিত করে। ফরাসী বিপ্লবের সময় executive decree-র দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করান, কমুনিষ্ট্ গবর্ণমেণ্টের প্রোপাগাণ্ডার সাহায্যে তাঁর অনস্তিত্বে বিশ্বাস করান, এবং ইটালীর concordat-এর সাহায্যে spiritual এবং temporal authority-র মধ্যে বনিবনাও করানর মধ্যে যে সচেতন ইচ্ছাশক্তির প্রমাণ আছে, কেবলমাত্র তারই দ্বারা বর্ত্তমান সভ্য জগতে আদিম যুগের ধর্ম্মপ্রবণতাকে এই যুগের কর্ম্মশীলতার সঙ্গে খাপ খাওয়ান যেতে পারে। কিন্তু মহাত্মাজী তা করছেন না। তাঁর নিজের মনে, হিন্দু-সভার মনে, মুসলিম লীগের মনে পলিটিক্স্ ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আমাদের বিরোধ-জ্ঞান কেবল মাত্র ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষেই খাটিয়ে নিঃশেষ হয়েছে। নচেৎ স্বরাজ পার্টির মধ্যে, কংগ্রেস দলের মধ্যে সামাজিক সংরক্ষণশীলতার প্রধান কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যায়!

অনেকে বলেন, সব হবে, তবে এক সঙ্গে নয়। যেটা প্রথম দরকারী সেইটে আগে হোক্, পরে সব; আগে রাজ্যভার আমাদের হাতে আসুক, পরে সমাজ-সংস্করণ, সাহিত্য-সৃষ্টি ইত্যাদি। এই আগে-পরে জিনিষটা ঠিক

বুঝি না। যদি আমাদের দেশাত্মবোধ জেগেই থাকে, তাহলে সেটা শুধু একটিমাত্র প্রণালীতে বইছে স্বীকার করা যায় না, আর যদি স্বীকার করাও যায়, তাহলে বইতে দেওয়া উচিত নয়, ভবিষ্যতের দিক থেকে। আমাদের পলিটিক্স্ বিরোধের, সৃষ্টির নয়। সর্ব্বদাই opposition party, বিরুদ্ধ দল হয়ে থাকাতে যে দায়িত্বহীনতা, সৃষ্টিবিমুখীনতা, আলস্য আসে, সে সবই আমাদের এসেছে, লক্ষ্য করেছি। 'পরে হবার' আশার মধ্যে যতটা ধৈর্য্যের ইঙ্গিত আছে, সেটুকু উপদেশেরই মধ্যে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কাজ করার মধ্যে সেটুকু নেই। একটা তারিখের মধ্যে স্বরাজ পাবার আশাতে অধৈর্য্যের প্রমাণই পাওয়া যায়। এ সবের পিছনে আছে একটা দায়িত্বহীনতা, যার জন্য দায়ী এই স্থায়ী-বিরোধের অবস্থা। বিরোধ না হলে চলে না—কিন্তু বিরোধকে সংঘবদ্ধ হবার একমাত্র উপায় ভাবার মতন একদেশদর্শিতা আর দু'টি নেই। যদি বিরোধকে নিজের স্থানে আবদ্ধ না রাখা হয়, তাহলে সর্ব্বনাশ হয়। সর্ব্বদাই বিরোধের উপর সৃষ্টির দৃষ্টি রাখতে হয়, তাকে একটা উপায় মাত্র ভাবতে হয়, তবেই লাভ। যেখানেই বিরোধ একটিমাত্র সামাজিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে, সেখানেই অন্যান্য সামাজিক ব্যবহার অস্বাভাবিক রকমে বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

এখন, আমাদের দেশের এই political obsession-এর ফলে বিরোধ-বৃত্তিকে সামলান যাচ্ছে না। অন্যান্য সমাজে যেমন খেলাধূলো, নাচগান, শোভাযাত্রা, লেখাপড়া, যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা বিরোধ প্রশমিত হয়, এদেশে তা আর হচ্ছে না, কেননা

ভারতবর্ষের গ্রাম্য-সমাজ ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে, তার বদলে এসেছে নগর-সভ্যতা। মূল খুইয়ে আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি। গ্রামকে পুনর্জ্জীবিত করার কোন উপায় দেখি না, এক ছোট সহর হতে পারে, যেখানে মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী বসবাস করবেন। কিন্তু তাঁরাই অন্নাভাবে লোপ পেতে বসেছেন, অতএব এখানেও হতাশ হতে হয়। সেইজন্য একটি উপায় মনে হয়, জনকয়েক লোকের এই আন্দোলনের বাইরে থেকে সৃষ্টির কাজে মনোনিয়োগ করা। বিরোধ-বৃত্তির কুফল হতে বাঁচতে ও বাঁচাতে হলে এক দল নিষ্কাম ও নির্ব্বিকার প্রবৃত্তির লোকের একান্ত প্রয়োজন। ঠিক এই সময় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, বিশ্ববিদ্যালয়ের, লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীর যত প্রয়োজন, অত প্রয়োজন বোধ হয় কখনও ছিল না।

বিরোধের মাত্র কয়টি কুফল দেখাচ্ছি। বিদেশী রাজাকে জব্দ করবার জন্য আমরা কি উপায় অবলম্বন করেছি একবার স্মরণ করি। আমরা ভাবাবেগের সাহায্য গ্রহণ করেছি, বুদ্ধি অর্থাৎ বিচারশক্তিকে সরিয়ে রেখে, তাকে কর্ম্মপ্রবণতার প্রতিকূল ভেবে। আমরা বিশেষ করে ধর্ম্মের সাহায্য গ্রহণ করেছি এই ভেবে যে ভারতবাসী বড়ই ধর্ম্মপ্রাণ। আমরা পলিটিক্স্‌টাকে নিতান্তই অবাস্তব জগতের সামগ্রী করে তুলেছি। আমরা সর্ব্বদাই বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে কুণ্ঠা বোধ করিনি। এখন উপায়মাত্রেরই এই স্বভাব যে, তার দোষগুণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে ও সার্থকতার সঙ্গে মিশে থাকে। যখন উদ্দেশ্য সফল হয় তখন তার সাধনের ইতিহাস সিদ্ধি থেকে মুছে যায় না। সেইজন্য আমার ভয় হয়

স্বরাজ গভর্ণমেণ্ট গণ-মনের ক্রীড়নক হবে ; এবং গণ-মন যে চপল, নির্ব্বোধ ও নিষ্ঠুর এ আর বলে দিতে হবে না। জনসাধারণকে জাগ্রত করা ভাল কাজ, পলিটিক্সের প্রধান কাজ। কিন্তু সত্যিকারের জাগ্রত অর্থাৎ শিক্ষিত হবার পূর্ব্বেই যদি জনগণ আধঘুমন্ত অবস্থায় ককিয়ে ওঠেন, তাহলে সেই ককানিকে vox dei বলে পূজো করার মতন শক্তির অপচয় আর কি হতে পারে ? এই জন-মতের প্রভাবেই হয়ত আমাদের যুদ্ধও করতে হবে এবং বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকের প্রতি অত্যাচারও করতে হবে। গণ-আন্দোলনের বিপদই এইখানে, সেটা anti-intellect-ual হয়েই পড়ে। তখন আদিম প্রবৃত্তির বশে মানুষে যা করে তাই ভাল বলে প্রমাণিত হয়। আমরাই প্রমাণ করি।

ধর্ম্মভাব শুনেছি দরকারী জিনিষ। কিন্তু পলিটিক্স্ আর ধর্ম্ম মিশলে অন্তত এই ধরণের কাজ আমরা করতে বাধ্য হব। স্বরাজ পেলেও দেশে চোর-জোচ্চোর থাকবে—আজ না হয় কাল মতপার্থক্যের জন্য একাধিক দল তৈরি হবে, তার মধ্যে একটি দলের লোকসংখ্যা অন্তত অন্যের অপেক্ষা কম হবে, তখন সেই ছোট দলের পাণ্ডাদের আদালতে হাজির করতে হবে, শাস্তিও দিতে হবে। সে শাস্তি আইনসঙ্গত হবে না—হবে ধর্ম্মসঙ্গত। Political offence হবে তখন sin, কিংবা heresy, এবং পাপ তাড়ানর জন্য মানুষের যত উৎসাহ অত উৎসাহ আর কিছুতে নেই। ভাগ্যে বিপিনচন্দ্র পাল স্বরাজ পাবার পূর্ব্বেই মারা গেছেন।

যে দেশাত্মা বিপিন পালের আবিষ্কৃত সেই দেশাত্মাই মূর্ত্ত হয়ে উঠবে একটা Hegelian State-এ,

একটা abstraction-এ, idea-তে। হেগেলের রাষ্ট্র ছিল দার্শনিক-বুদ্ধিগত, আমাদের হবে ধর্ম্মগত, অনেকটা বর্ত্তমান ইটালীর Corporate state-এর মতন। ততদিনে আশা করি লাঠির বদলে সড়কি, জোলাপের বদলে আর্সেনিকের চলন হবে। যে দৈত্য সামনাসামনি যুদ্ধ করে তার সঙ্গে পারা যায়, কিন্তু যে মেঘের আড়াল থেকে বাণ ছোঁড়ে তার অবাস্তবতা আমাদের এতই মুহ্যমান করে যে তার বিপক্ষে হাত তোলার শক্তিই থাকে না।

সব চেয়ে ভয় হয় যে বিরোধের নেশায় আমরা সৃষ্টির অবসর পাব' না। খানিকটা বিনিময়, আইন কানুন, অনুশাসন ও অবসর দেশকে পেতেই হবে। কিন্তু দায়িত্বহীন সমালোচকের দল থাকবেই, কর্ম্মবিমুখতার অভ্যাস সহজে ঘোচে না, নিরর্থক সমালোচনার মোহ অনেক দূর জের টানে, কুঁড়েমীর মজা অনেকদিন থাকে। শুধু কথার জন্য কথা কওয়ার অভ্যাস ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর রুশিয়ান বিপ্লববাদীদের, এখনও যে সেই পুরাতন অভ্যাসের দোষেই পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান ততটা সার্থক হচ্ছে না এ কথা নিজেই ষ্ট্যালিন্ স্বীকার করেছেন। এই বিরোধের জন্য বিরোধের অভ্যাসই আমাদের স্বরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রধান শত্রু হবে। সাহিত্যেরও সর্ব্বনাশ হবে আমার মত সমালোচকদের হাতে পড়ে।

আজ যদি এই বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়োজন থাকে, তাহলে এখন থেকেই সাবধান হতে হবে —ভাবাবেগকে দমন করতে হবে, রিয়ালিষ্ট হতে হবে, ধর্ম্মকে নিজের কোঠায় বন্দী রাখতে হবে, সৃষ্টির কাজ সুরু করতে হবে, সেজন্য সুবিধা দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান

চাই। নিজেদের দেশের কথাই আমরা জানি না। কী আশ্চর্য্য! প্রত্যেক দেশের একটা দলেরই না কত Research Bureau আছে—তাদের গবেষণা একটু একদেশদর্শী হলেও, তাদের fact-finding zeal-কে অগ্রাহ্য করা যায় না। আমাদের কংগ্রেস এতদিন ধরে কাজ করে আসছে, আমাদের কাজ ভারতের মতন মহাদেশকে স্বাধীন করা, অথচ এতদিনে একটা Research Bureau স্থাপিত হলো না। এ জগতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই প্রধান বল, তাই আমাদের নেই। আমাদের প্রতিনিধিরা বই কিংবা রিপোর্ট পড়েন না, কিংবা যখন পড়েন তখন সেখানে কোথায় কোন্ ঘটনা, কোন্ সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছে দেখাবার সামর্থ্য নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছে এই facts যোগান দেবার প্রত্যাশা করা যায় না। তাদের না আছে সময়, না আছে সুবিধা, না আছে সাহস, না আছে ক্ষমতা। যদি কোন বড় সাহেব বলেন, দেশের লোকেরা আর্থিক হিসাবে উন্নত হচ্ছে, আমাদের হাতে এমন কোন statistics নেই যার দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি, দেশের লোক গরীব হয়ে যাচ্ছে। যদি বড় কর্ত্তারা বলেন—লোকসংখ্যার হার বাড়ছে, তবুও দেশের দুর্দ্দশা বাড়েনি—আমরা না বলতে পারি না, জোর বলতে পারি —জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। ভাবের বদলে জ্ঞানের সাধনাকেই দেশের একমাত্র আশা বিবেচনা করি।

প্রগতি

প্রগতি বোল্‌তে আদর্শ কিংবা প্রেরণা অনুসারে অগ্রসর হওয়া বুঝি।

মানুষই আদর্শ সৃষ্টি করে। মানুষই প্রেরণার আধার। মানুষই অগ্রসর হয়।

অগ্রসর হওয়ার জন্য পরিবর্ত্তন চাই।

(২)

মানুষের অগ্রসৃতি সরল রেখায় নয়। অতএব পুরাতন জ্যামিতির নিয়ম এখানে সম্পূর্ণভাবে খাটে না।

জীবজগতের পরিবর্ত্তন চারিধারে হয়। মানুষের পরিবর্ত্তন তারও বাইরে। সেখানে দিক্‌নির্ণয় অসম্ভব, দিক্ নেই বোলে। মানুষ তার জ্যামিতি এবং জীবতত্ত্বের অংশটুকু জয় কোরে দিক্ হারিয়ে ফেলে।

জীবের পরিণতি কালের মধ্যেই। মানুষের জীবনে কমা থেকে দাঁড়ি সবই আছে মনে হয়, কিন্তু নেই। মানুষের স্থিতি হচ্ছে মৃত্যু। জীবের স্থিতি ও গতি, মানুষের কিন্তু মতি। অতএব জীবতত্ত্বের অভিব্যক্তিবাদ এখানে সম্পূর্ণভাবে খাটে না।

মানুষ জড় ও জীব। তার ওপর মানুষের আত্মা আছে। অতএব জড় ও জীবজগতের নিয়ম এ-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য না হলেও, একেবারে ভুল নয়। ভুল সংশোধিত হয়, অসম্পূর্ণতা লুপ্ত হয়, আত্মার সন্ধান পেলে। আত্মার কি নিয়ম জানি না। বোধ হয়, আত্মা নিয়মকর্ত্তা, আপনাতে আপনি অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ

স্বাধীন। অতএব মানুষের পক্ষে পরিবর্ত্তনের পরিণতি মানুষের স্ব-অধীনতা।

(৩)

প্রেরণা পূর্ব্বকালের, আদর্শ উত্তরকালের।

মানুষের সব কাজই প্রেরণা-সম্ভূত কিংবা আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত বিশ্বাস কোরতে গেলে স্নানঘরের কলের জলকে সত্য এবং স্রোতের জলকে মিথ্যা গণ্য কোরতে হয়।

গোমুখীতে তীর্থস্নান না কোরে টালার ট্যাঙ্কের তলায় মাথা রাখলে কাজ চলে, পুণ্য হয় না।

(৪)

আদর্শের উৎপত্তি পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বে। কালও প্রকৃতি। যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিজের জড়প্রকৃতি এবং বর্ত্তমানের সঙ্গে মানুষের গরমিল হয়, তখনই দ্বন্দ্বের বাইরে যাবার ইচ্ছা হয়।

অশান্তির ফল দিবাস্বপ্ন, ইয়ুটোপিয়া, রামরাজত্ব, সত্যযুগ।

বাইরের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য শক্তি চাই। সব চেয়ে বড় শক্তি মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলি। তাদের মধ্যে যে কয়টির সাহায্যে অশান্তি দূরীভূত হওয়া সম্ভব, সেইগুলির ব্যবহার স্থিরীকৃত হলেই ধর্ম্মাচার আরম্ভ হয়। আচারগুলি প্রথম প্রথম আদর্শের সহায় হয়, তারপর তারা মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রভাবের নাম ধর্ম্মবুদ্ধি। তৈরি জিনিষ হাতের কাছে পেলে কে আর খাট্‌তে চায়? তখন মানুষ সব ধার্ম্মিক হয়ে ওঠে।

আদর্শের পরিণতি ধর্ম্মগত প্রাণ হওয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি আদর্শের কারণ নয়। যে মানুষের মন ধর্ম্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন না হলো, সে মানুষের মন নতুন আদর্শ গড়তে সুরু কোরলে। অন্যের ধর্ম্মবুদ্ধি, এমন কি নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিও, নতুন আদর্শ-গঠনের অন্তরায়। তখন আবার অশান্তি। এই চল্‌ল চিরকাল।

(৫)

ভিতরের আদর্শ-গঠন এক প্রকারের মূল্য-নির্দ্ধারণ। সে মূল্যের ভিত্তি সংখ্যা হলে আপেক্ষিকতার অর্থ কেবল বিয়োগ হোত। জীবন সরলরেখা হলেও তাই, যেমন কগ একটি সরল রেখা হলে ভিতরের কখ = কগ — খগ। অসমতল ক্ষেত্র ও বক্ররেখা হলে শুধু বিয়োগ হবে না। তখন একটি বিন্দুর মূল্য নেহাৎ একান্ত, অথচ তার নিকটবর্ত্তী ঐ ধরণের মূল্যবান অনেক বিন্দু রয়েছে।

অন্তর থেকে আদর্শগড়ার মানে ফুটে ওঠা। মানুষ ফুটে ওঠে, চারিধারে ও বাইরে। তাতেও সময় লাগে।

(৬)

মূল্য শুধু সময়ের ওপর স্থাপিত কোরলে, যা কিছু হচ্ছে কি হবে, তাই, যা হয়ে গিয়েছে তার চেয়ে ভাল কিংবা মন্দ প্রমাণিত হোত। বস্তুত তা নয়। অথচ সবই বদলাচ্ছে। সেইজন্য মূল্যের গুরুত্ব নির্ভর করে কোন্‌টি কালের অতীত এবং কিসের সাহায্যে কালের অতীত হওয়া যায়, তার ওপর। যেমন সা, রে, গা, মা সাধবার পর গানের স্বাধীনতা। সমাজের ভেতর থেকে সমাজের বাইরে গেলেই মানুষ মানুষ হয়। অতএব,

এইটাই আদর্শ। দ্বীপের মধ্যে রবিন্‌সন্ ক্রুসোর বাহাদুরী হিন্দুসভার গোঁড়া সঙ্ঘের মতনই।

(৭)

বুদ্ধি দিয়ে আদর্শ সৃজন কোরলে মানুষ কর্ত্তৃত্ব করবার আত্মপ্রসাদ উপভোগ কোরতে পারে, কিন্তু জীবনটা হয় কল। জীবনের খানিকটা কল, খানিকটা জীব— কিন্তু গোটা জীবন তারও অতিরিক্ত একটি অখণ্ড শক্তি। এই শক্তি আত্মার। আত্মশক্তি, আত্মোপলব্ধির, আত্মানুভূতির ফল। 'উন্নতি' মানে মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ।

(৮)

মানুষ বোলতে ব্যক্তি বুঝি। সমাজ কিংবা দেশের কোন আত্মা নেই। আছে শুধু ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং আচার ব্যবহারের বিশেষত্ব। সমাজ ব্যক্তির সহায় এবং সুবিধা মাত্র। দেশাত্মবোধ আত্মার সংশ্লিষ্ট কোন বস্তু নয়, ব্যক্তিগত মনের তৈরি, এবং সেই মনেরই তৈরি সুবিধাসূচক মন্ত্র মাত্র। ব্যক্তিরই মন ও আত্মা আছে। ব্যক্তিই ইতিহাস সৃষ্টি করে, সমাজ নয়।

(৯)

সমাজের সভ্যতা, ব্যক্তির বৈদগ্ধ্য। বৈদগ্ধ্যই পরিবর্ত্তন, অগ্রসৃতি এবং প্রগতির মূলগতি। সভ্যতা সেই গতির রুদ্ধ অবস্থা, চরম অবস্থা, অর্থাৎ মৃত্যু। বৈদগ্ধ্য আত্মার বিকাশ। বুদ্ধির দ্বারা সেই বিকাশকে নিয়মে গ্রথিত কোরে বোঝবার প্রয়াসকে সভ্যতা বলা যেতে পারে।

বেদান্তে উপনিষদ, সভ্যতায় টীকাভাষ্য। একটিতে মানুষ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, আর্টিষ্ট, সম্পূর্ণ মানুষ; অন্যটিতে মানুষ কলের কুলী, যজ্ঞের পুরোহিত, স্কুল-মাষ্টার এবং সাহিত্যক্ষেত্রের সমালোচক ও প্রবন্ধলেখক। একটির দেবতা ব্রহ্মা—রবীন্দ্রনাথ, দ্রষ্টা ও স্রষ্টা; অন্যটির দেবতা বিষ্ণু—৺ভূদেবচন্দ্র, ভর্ত্তা ও রক্ষক।

(১০)

অতএব 'সামাজিক উন্নতি'র কোনো মানে নেই। যে সমাজে আত্মার যতটুকু বিকাশ সম্ভব সে সমাজ ততটুকু উন্নত। নিজের মৃত্যু দিয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিকাশের অবকাশ দেওয়াই উন্নত সমাজের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই অবকাশ কিংবা সুযোগই আসল জিনিষ, সমাজে কয়জন আত্মজ্ঞ ব্যক্তি আছেন তাঁদের সংখ্যা আসল জিনিষ নয়। সংখ্যামূলক কিংবা তুলনামূলক বিচারে আত্মবিকাশের কোন মূল্য নেই। হয়ত একটা রবীন্দ্রনাথ দশটা শেলীর মতন, একটা ঋষি কুড়িটা সেণ্ট্ ফ্রান্সিসের সমান! হয়ত বিপরীত, কে জানে?

সন ১৩৩৪